বেলুড় মঠে
স্বামীজীর দুর্গাপূজা

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

বেলুড় মঠে

স্বামীজীর দুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে

স্বামীজীর দুর্গাপূজা

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা এক অনন্য অনুষ্ঠান। এ পূজা স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত এবং শ্রীমা সারদা দেবীর নামে সঙ্কল্পিত। আবার স্বামীজীর দৃষ্টিতে মা সারদাও স্বয়ং 'জ্যান্ত দুর্গা'। প্রায় শতবর্ষ ধরে নৈষ্ঠিকতায় অতুলনীয় এ পূজা এবং অনুপম এর ক্রিয়াকাণ্ড। অষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজা দেখতে আজও অগণিত মানুষের ভিড় হয় বেলুড় মঠে। ১৯০১ সালে প্রথম পূজায় স্বামীজী স্বয়ং কয়েকজন কুমারী মেয়েকে 'জগন্মাতা' জ্ঞানে পূজা করেন। কিন্তু এ পূজা বেলুড় মঠে কেন প্রচলিত হলো এবং কেমনভাবে সন্ন্যাসীদের দ্বারা তা অনুষ্ঠিত হয় সেসব কাহিনীই সংক্ষেপে 'বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা' গ্রন্থে লিখিত।

আশাকরি স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের অন্যান্য পুস্তকের মতো এই পুস্তকটিও পাঠকদের দ্বারা সমাদৃত হবে।

লেখকের নিবেদন

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।।
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী, লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশ কুমার গণেশ আমার,
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি।।[১]

এই 'আগমনী' গানটি স্বামী বিবেকানন্দের বড়ই প্রিয় ছিল। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর প্রিয় বিল্ববৃক্ষতলে বসে প্রায়ই গাইতেন এই গান। ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা স্বামীজীরই ঈঙ্গিত ও পরিকল্পিত, অন্য অর্থে স্বামীজীর কণ্ঠে গাওয়া আগমনী-গানের তাই যেন বাস্তবরূপ। এরপর বেলুড় মঠের এই ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা আজ প্রায় একশো বছর ধরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই প্রথম দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীও উপস্থিত ছিলেন এবং এই পূজা তাঁরই নামে 'সঙ্কল্পিত' এবং সেই ধারা আজও চলে আসছে। আসলে সন্ন্যাসীরা কোন বৈদিক পূজা বা ক্রিয়াকাণ্ড করার অধিকারী নন বলেই আদর্শ গৃহস্থাশ্রমী (যিনি আবার সন্ন্যাসীরও আদর্শ এবং স্বামীজীর দৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং 'জ্যান্ত দুর্গা') শ্রীশ্রীমার নামেই বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত ও সঙ্কল্পিত হয়। বিষয়টি খুবই অভিনব এই কারণে যে শ্রীমা সারদাদেবীর

দেহত্যাগের প্রায় এক শতাব্দী পরেও বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা সেই একই ধারায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে (নাকি প্রকারান্তরে তা 'জ্যান্ত দুর্গা'রই পূজা) কিন্তু যে সন্ন্যাসীরা বৈদিক পূজা বা ক্রিয়াকাণ্ড করার অধিকারী নন, তাঁরাই আবার কেন এই পূজায় অভিলাষী হলেন এবং কেমন ভাবেই বা তাঁদের দ্বারা এইসব ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সেই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীই 'বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা' পুস্তকটিতে বিধৃত। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার অন্যতম অনুষ্ঠান কুমারী-পূজা নিয়েও সাধারণের কৌতূহল অপরিসীম। এই কুমারী পূজা কি এবং কেমনভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেকথাও এই পুস্তকে বর্ণিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দেশ' পত্রিকায় লেখক 'বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা' নিয়ে সচিত্র একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি পাঠকমহলে খুবই সাড়া জাগায়। সেইসময় জনৈক পাঠক স্বামীজীর কুমারী-পূজা বিষয়ে একটি অজানা ও আশ্চর্যজনক তথ্য 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই চিঠিও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীর ভ্রমণকালে স্বামীজী এক মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকে 'কুমারী রূপে' যে পূজা করেন—তা ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে আমরা আগেই জেনেছি।[২]

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁর গুরুভ্রাতা ও উত্তরসূরীদের দ্বারা কিভাবে বেলুড় মঠের এই ঐতিহ্যবাহী 'দুর্গাপূজা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেসব কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য লেখক বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসীরই অকুণ্ঠ সহযোগিতা, স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছেন। 'দেশ' পত্রিকায় রচনা-

প্রকাশকালেই পরমপূজনীয় স্বামী কল্যাণেশ্বরানন্দজী লেখককে 'দুর্গাপূজা'র ছবিগুলি দিয়ে সাহায্য করেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি আজ আর ইহলোকে নেই। এই গ্রন্থ রচনার বিষয়ে যাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণার কথা সর্বাগ্রে আমার মনে পড়ে তাঁরা হলেন বেলুড় মঠের বর্তমান ম্যানেজার পরম পূজনীয় স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর (উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দজী মহারাজ, এঁদের কাছে আমি চিরঋণী। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে আমাকে অবহিত করেন মঠের শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের বর্তমান পূজারী স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী মহারাজ। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

শারদীয়া পূজার শুভলগ্নে ভক্তি-অর্ঘ্য-স্বরূপ 'বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা' পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আনন্দিত এবং এই সুবাদে জগজ্জননী মহামায়ার কাছে সকলের নিরন্তর সুখ-শান্তি প্রার্থনা করি।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামীজীর দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা	১
জ্যান্ত দুর্গা	২
কি আনন্দের কথা উমে গো মা	৪
প্রথম দুর্গাপূজা	৬
প্রত্যক্ষদর্শীর কথা	৭
অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি	১০
কুমারী পূজার কথা	১৫
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বপ্নদর্শন	১৯
আসবে কত দণ্ডী, জটাজূটধারী	২০
প্রেমানন্দ ও সারদানন্দের মাতৃবন্দনা	২০
শিবানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' বন্দনা	২৩
আগমনী গান ও কাঠামো পূজা	২৪
দুর্গাপূজার সময়-নির্ঘণ্ট	২৫
পূজার উপকরণ ও বলি-প্রদান	২৭
সানাই, ঢাক, ঢোল-কাঁসর-ঘন্টা	২৮
শালগ্রাম শিলা (নারায়ণ) পূজা	২৮
প্রসাদ বিতরণ	২৯
বিজয়া দশমী	২৯
পরিশিষ্ট —১ দুর্গা: মহাশক্তি ও মহামাধুর্যের প্রতীক	৩২
২ কুমারী পূজা কি ও কেন	৩৯
৩ হিমালয় কন্যা উমা পার্বতী বা হৈমবতী	৪৪
৪ দেশদেশান্তরে দুর্গা	৫৬

বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা

স্বামীজীর দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা

স্থান — বেলুড় মঠ

কাল ১৯০১

স্বামীজী—ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শিগগির আমার জন্য নিয়ে আসবি।

শিষ্য—আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামীজী—কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাংলা দেশ তো তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তৎকৃত হিন্দুজীবনের গর্ভাধান থেকে শ্মশানান্ত আচার প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচে-প্রস্রাবে, খেতে-শুতে, অন্য সকল বিষয়ের তো কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে বন্ধন বহুকাল স্থায়ী হতে পারল না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজের আচার প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখতে পাব ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্যন্ত একভাবে রয়েছে। তবে তার Interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে এইমাত্র।

শিষ্য—আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামীজী—এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছা হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পুজো করব। তাই দুর্গোৎসব বিধি পড়বার ইচ্ছা হয়েছে। তুই আগামী রবিবার যখন আসবি, তখন ঐ পুস্তকখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবি।

শিষ্য — যে আজ্ঞা।[৩]

জ্যান্ত দুর্গা

বেলুড় মঠের ঐতিহ্যগত দুর্গাপুজোর এই প্রেক্ষাপট। তবে মঠে মৃন্ময়ী মূর্তি এনে আরাধনার আগে স্বামীজী এক চিন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠার ধ্যান বা পরিকল্পনাও করেছিলেন। তিনি স্বামীজীর জ্যান্ত দুর্গা—শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ-জননী—মা সারদামণি।

বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত জ্যান্ত দুর্গার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সেই ঐতিহাসিক চিঠিটির কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা থেকে স্বামীজী চিঠিটি লেখেন তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দজীকে। বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামীজীর তখন জয়জয়কার। এ জয় শ্রীরামকৃষ্ণেরও তথা সনাতন হিন্দুধর্মের। এই সময়েই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সক্রিয় করার জন্য একটি স্থায়ী কেন্দ্র বা মঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও করেন। শক্তিরূপিণী মা সারদামণি তাঁর এই প্রেরণার উৎস। তখনো বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদরা প্রথমে বরাহনগরের একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে (যা ভুতুড়ে বাড়ি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল) কিছুদিন বসবাস করে পরে তা অব্যবহার্য বলে কলকাতারই আলমবাজার অঞ্চলে অন্য একটি ভাড়া বাড়িতে এসে ওঠেন। এদিকে বিশ্বধর্মমহাসভায় বিজয়লাভ করে স্বামীজী ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে যেসব

নবীন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার মধ্যে একটি স্থায়ী কেন্দ্র বা মঠ স্থাপনের বিষয়ও ছিল।

শক্তিরূপিণী মা সারদামণির বিষয়ে স্বামী শিবানন্দজীকে * লিখিত স্বামীজীর সেই ঐতিহাসিক চিঠিটির কিছু অংশ—"মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখন কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। ... আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে। দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি?

"...এই দারুণ শীতে গায়ে গায়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।

** স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকেও অনুরূপ এক পত্র দেন। 'অতীতের স্মৃতিতে' (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখিত) জানা যায় — "রাজা মহারাজজীর নিকট জমা চিঠিগুলির মধ্যে স্বামীজীর একখানি বহু মূল্যবান দীর্ঘ চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তাহাতে স্বামীজী শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে নিজের ধারণার বিষয় খুব আবেগ ভরে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা এত সহজ ভাষায় বর্ণনা — কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ) পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। চিঠিখানি যে টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেন উহার ড্রয়ারে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন।" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, উক্ত চিঠিটি কিভাবে হারিয়ে যায়।*

"বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।..." [৪]

কি আনন্দের কথা উমে গো মা

এক সময় (সম্ভবত ১৮৯১ সাল) জয়রামবাটী গ্রামে একজন বৈরাগী (হরিদাস) এসে প্রায়ই বেহালা বাজিয়ে গাইত দাশরথি রায়ের লেখা একটি আগমনী গান —

" কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ওমা) লোকমুখে শুনি সত্য বল শিবানি,
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে?
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি।
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
এখন নাকি তাঁর দ্বারে আছে দ্বারী,
দেখা পায় না তাঁর ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে।।
ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা আবার বল্‌ত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে,
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে।।

এই গান শুনে চোখের জলে ভাসতেন মা শ্যামাসুন্দরী দেবী—ও গান যেন তাঁর মেয়ে সারদামণিরও জীবনসঙ্গীত। চোখে তাঁর দেখা দিত আনন্দাশ্রু, গানটি বারবার শুনেও যেন তৃপ্তি হতো না। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে উপস্থিত সবাইকে বলতেন—"হ্যাঁ গো, তখন সকলেই জামাইকে ক্ষেপা বলত, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। আমায় কত কথা শোনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ, কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা পূজা করছে।"[৫]

সত্যিই তো, এ মেয়ের জন্য কম গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাঁকে? জয়রামবাটী গ্রামের সর্বত্র জানাজানি হয়ে গিয়েছিল সে কথা—দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে পূজারী হয়ে তাঁর জামাই নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে—রাতদিন কেবলই মা! মা! করে কাঁদে। আর সেসব কথা শুনে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা তাই কানাকানি করত—"ওমা! শ্যামার মেয়ের ক্ষেপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে।" আর তা শুনে মেয়ের দুঃখে মায়ের বুক ভেঙে যেত। ভাবতেন, সবই অদৃষ্টের ফের! কিন্তু এই বুক ভাঙা দুঃখের মাঝেও শ্যামাসুন্দরী দেবী সময় সময় একটু সান্ত্বনা পেতেন যখন ঐ গাঁয়েরই শুদ্ধস্বভাবা ভানুপিসী এসে খুব জোরের সঙ্গে তাঁকে বলতেন—"বউ ঠাকরুন, তোমার জামাই শিব, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—এখন যা বিশ্বাস করতে পারছ না, পরে পারবে বলে রাখছি।"[৬]

সারদামণিও জানতেন সে কথা। গিরিরাজ কন্যা উমার মতোই জানতেন তাঁর আত্মভোলা পতির স্বরূপ। জানতেন, গাঁয়ে যা রটেছে তা সত্যি নয়। তাঁর দেবতুল্য পতি পাগল হতেই পারেন না। মন তাঁর পড়ে থাকে দক্ষিণেশ্বরে—সেখানে গিয়ে পতিদেবতার সেবাযত্নের জন্য আকুল আগ্রহে দিন কাটাতে থাকেন। সে সুযোগও তাঁর এসে যায়। সেবার (চৈত্র মাস, ১২৭৮ সাল) কি এক পর্ব উপলক্ষে গ্রাম থেকে অনেক লোক

কলকাতায় এসেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। সেই সময় সারদামণিও ভাবেন—“সবাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কেমন আছেন।”[৭] বাবা তাঁর সেই মনের কথা বুঝতে পেরে তাঁকে নিয়ে হাঁটাপথে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হলেন।

অনেক কষ্টে সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলে তাঁর আপনভোলা পতি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। দেখেশুনে সারদামণি বুঝলেন, গাঁয়ে যা রটেছে তা মিথ্যে—সব মিথ্যে। তাঁর পতি পাগল কোথা—তিনি যে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তের রাজা। তাঁকে নিয়ে সেখানে আনন্দের হাট—পতি তাঁর আশ্রিতবৎসল—যে তাঁর শরণাগত তাঁকেই আশ্রয় দিচ্ছেন—দেখাচ্ছেন ভক্তি-মুক্তির পথ।

তাই জয়রামবাটীতে সেই বৈরাগীর আগমনী গান শুনে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের সেই অধ্যায়ের কথাই তখন সকলের মনে পড়ে যেত। সে গান শুনে অনেকেই কাঁদতেন, যেমন কাঁদতেন শ্যামাসুন্দরী দেবী, সেইসঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা—সারদামণির দুই সহচরী। এমনকি মহাকবি গিরিশচন্দ্রও যখন কলকাতা থেকে আসতেন, এই গান শুনে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। তিনি শ্রীমাকে মনে করতেন—“মা জগদম্বা, জগজ্জননী”। আর বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, মা সারদামণি তাঁর কাছে ছিলেন সাক্ষাৎ ‘জ্যান্ত দুর্গা’।

প্রথম দুর্গাপূজা

বেলুড় মঠের শারদীয়া দুর্গাপূজার ঐতিহ্যগত তাৎপর্য হলো ১৯০১ সালে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারাই এই পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও এই পূজার সময় বেলুড় মঠে

উপস্থিত ছিলেন স্বামীজীরই ইচ্ছানুসারে। শ্রীশ্রীমায়ের নামেই এই পূজার 'সঙ্কল্প' করা হয় (এবং আজও সেই ধারাই চলে আসছে)। আসলে সন্ন্যাসিগণ 'সঙ্কল্প' করে কোন পূজা বা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড করার অধিকারী নন বলেই আদর্শ গৃহস্থাশ্রমী শ্রীশ্রীমার (যদিও ত্যাগ-তপস্যায় তিনি সন্ন্যাসীরও শিরোমণি) নামেই বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়টি খুবই অভিনব এই কারণে যে, শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের এত বছর পরেও সেই একই ধারায় বেলুড় মঠের পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অথবা স্বামীজী যে কল্পনা করতেন শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গারূপে', প্রতি বছর মৃন্ময়ী মূর্তিতে কী সেই চিন্ময়ী মায়েরই অধিষ্ঠান হয়? আমরা এও জানি, স্বামীজী 'আগমনী' গান বড়ই ভালবাসতেন এবং নিজেও গাইতেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর কণ্ঠে 'আগমনী' গান শুনে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বেলুড় মঠেও স্বামীজী প্রায়ই একটি 'আগমনী' গান গাইতেন তাঁর প্রিয় বিল্ববৃক্ষতলে বসে। গানটি হলো —

"গিরি গণেশ আমার শুভকারী,
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী জটাজূটধারী।"

প্রত্যক্ষদর্শীর কথা

বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজার সূচনার বিষয়ে আরো একটি কাহিনী শোনা যায়। স্বামীজীর প্রিয় গৃহী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন—"বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে

অনেকে আচার ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত প্রত্যাগত স্বামীজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দু নামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চলতি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসা অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামীজীর অমলধবল চরিত্র-আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না।'' শিষ্যের মুখে এসব কথা শুনে স্বামীজী একটুও উত্তেজিত হতেন না, বরঞ্চ শিষ্যকে বোঝাতেন—''দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতে ধর্মসংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।''[৮]

স্বামীজী কিন্তু সব সময়েই বলতেন—''আমি (শাস্ত্রমর্যাদা) নষ্ট করতে আসি নি—পূর্ণ করতে এসেছি (I have come to fulfil and not to destroy.)।'' সেই কারণেও তিনি দুর্গাপূজার (পরবর্তী সময়ে লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজাও) যথাবিধি অনুষ্ঠান করে নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের বেলুড় মঠ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চেয়েছিলেন।

আবার এ-ও শোনা যায়, স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করার বিষয় চিন্তা করছিলেন, সেই সময় তাঁর জনৈক সন্ন্যাসী ভ্রাতার একটি অলৌকিক স্বপ্ন-দর্শনও হয়েছিল। তিনি দেখেন যে, সাক্ষাৎ মা দশভূজা দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন। গুরুভ্রাতার মুখে এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে স্বামীজী আরো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, ''যেরূপে হোক, এবার মঠে পুজো করতেই

হবে।" তখন শারদীয়া পূজার আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। সেদিনই স্বামীজীর নির্দেশে একজন সন্ন্যাসী গেলেন কলকাতার কুমোরটুলীতে প্রতিমার বায়না করতে, আর একজন গেলেন বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার অনুমতি আনতে। সৌভাগ্যক্রমে বায়না করতে দেরি হওয়া সত্ত্বেও কুমোরটুলীতে একটি মৃন্ময়ী প্রতিমাও পাওয়া গেল, এবং বাগবাজারে চিন্ময়ী মায়ের অনুমতি মিলল। এতে স্বামীজীর আনন্দের সীমা নেই। আগেই বলা হয়েছে তিনি যথাবিধি দুর্গা পূজা করার জন্য স্মৃতিকার রঘুনন্দনের একখানি 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'ও সংগ্রহ করেন। পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে স্বামীজী বললেন, "রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব।" এই প্রসঙ্গে আর একবার বলেছিলেন, "মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে প্রলয়ে, মহালয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।"[৯]

এরপর বেলুড় মঠের সেই প্রথম শারদীয়া দুর্গাপূজা মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যথা সময়েই প্রতিমা এসেছিল কুমোরটুলী থেকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ওপর ভার পড়েছিল পূজার সবরকম উপকরণ সংগ্রহের। পূজকের আসনে বসেছিলেন কৃষ্ণলাল নামে জনৈক নবীন ব্রহ্মচারী। তন্ত্রধারক হয়েছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ষষ্ঠীর দিন থেকে বেলুড় মঠে আনন্দ আর ধরে না। বোধনের আগের দিন থেকেই স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমা বেলুড় মঠের পাশেই একটি ভাড়াটে বাড়িতে এসে বাস করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তগণ তো নিমন্ত্রিত হয়েছিলেনই, এ ছাড়া বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শোনা যায়, এর পর থেকেই গোঁড়া হিন্দুদের বেলুড় মঠ সম্বন্ধে বিদ্বেষ কমতে শুরু করে। তবে শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত অনিচ্ছা বলে বিধি থাকা সত্ত্বেও বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় পশুবলি-প্রদান নিষিদ্ধ হয়, তবে নিয়ম রক্ষার জন্য কিছু ফল বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হয়।

বেলুড় মঠের সেই প্রথম দুর্গাপূজার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে স্বামীজীর এই গৃহী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন—"মহা সমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসব কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! ঢাক-ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্" — কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উপস্থিত, যাহা স্বামীজীর সঙ্কল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্যসম্পাদক, সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরীব দুঃখীর ভোজন-তৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ তিনদিন পরিপূর্ণ হইল।"[১০]

অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি

বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজা বিষয়ে এ যাবৎ দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আমরা জেনেছি। অপরজন কুমুদবন্ধু সেনও ঐ পূজার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনিও তাঁর ডায়েরিতে ঐ পূজার বিষয়ে লিখে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি তা প্রকাশ করেননি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সযত্নে সে-ডায়েরি নিজের কাছে রক্ষা করার পর 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩৬০-৬১,৯ম সংখ্যা) তিনি ঐ পূজার বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বিবরণ

প্রকাশ করেন। কুমুদবন্ধু সেনের সেই ডায়েরির কিছু অংশ —

"৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন—ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুর ঘরের নিচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি— আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তরদিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়— সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

১লা কার্তিক (১৮ অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—

"স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতা বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীজগজ্জননী দুর্গামায়ীর আজ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

"প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত

তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিতকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন—তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রসুনচৌকীর সানাই মধুরসুরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদুর্গামায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

"শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশুবলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন—একদিকে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা—দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমলদলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপরদিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকভাবে পূজা-মণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

"স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথায়' (প্রথম ভাগ) আছে—শ্রীমা বলিতেছেন, 'পূজার

অষ্টমীর সন্ধ্যায় দর্শনীয় আরতি

দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, "মা, আমার জ্বর করে দাও।" ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জ্বর এল। আমি বলি, "ওমা একি হলো, এখন কি হবে?" নরেন বললে, "কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে, আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।" তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, "ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।" নরেন বললে, "হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি"—বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল। মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিক-ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্যকৌতুক করিতে দেখিয়াছি — সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন —কখনো গুনগুন স্বরে গাহিতেছেন—

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও,
আপনি দাও মা করতালি।।

"রবিবার মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতলায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

“পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজামণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দন জবা বিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল—ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

“মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

“৫ কার্তিক মঙ্গলবার বিজয়া দশমী। অপরাহ্ণে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল—তখন ঢাক, ঢোল, রসুনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল চারিদিকে “মহামায়ী কী জয় — দুর্গামায়ী কী জয়” শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাকভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নিচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতালার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

“নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘন ঘন উচ্চকণ্ঠে ‘মহামায়ী কী জয় — দুর্গামায়ী কী জয়’ ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে

নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল—প্রতিমার বিসর্জনে।

"পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী সাধু-ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজার যে আনন্দ ও অপূর্ব ভাব উদ্দীপিত হয়—তাহা অন্যত্র দুর্লভ।"

কুমারী পূজার কথা

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার একটি বিশেষ দিক হলো কুমারী পূজা যা প্রথমাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও একাধিক কুমারীকে পূজা করেছিলেন বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায়। এই বিষয়ে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়— '... স্বামী বিবেকানন্দের আমন্ত্রণে মাতা (শ্রীশ্রীমা) ১৩০৮ সালে বেলুড়ে দুর্গাপূজায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাই মঠে প্রথম দুর্গোৎসব। মায়ের অনুমতি লইয়া পূজার ব্যবস্থা এবং তাঁহার নামেই সঙ্কল্প হয়। এই উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে বিরাট সুরম্য মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল। মায়ের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দের মধ্যে মহাপূজা সুসম্পন্ন হয়। মায়ের নির্দেশে দেবীপুজোয় জীববলি বন্ধ থাকে।

"স্বামীজীর অনুরোধে গৌরীমা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা) কুমারী পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খবলয়-বস্ত্রাদি সহযোগে স্বামীজী স্বয়ং নয়জন অল্পবয়স্কা কুমারীকে পূজা করেন। এই সকল জীবন্ত প্রতিমার চরণে অঞ্জলি এবং তাঁহাদের হাতে মিষ্টান্ন, দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া স্বামীজী তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। একজন কুমারী এতই অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং পূজাকালে এমনই ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার

কপালে রক্তচন্দন পরাইবার সময় স্বামীজী শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন —'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো'।''

উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে স্বয়ং শ্রীশ্রীমাও এইসব কুমারীদের ঐদিন 'এয়োরানী পূজা' করেন। স্বামীজীর কুমারী পূজা বিষয়ে কিছু আশ্চর্য কাহিনীও জানা যায়।* কাশ্মীর ভ্রমণকালে স্বামীজী এক মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকেও 'কুমারী পূজা' করেন। বর্তমানে বেলুড় মঠে মহাষ্টমী পূজার দিন পাঁচ থেকে সাত বছরের একটি কুমারীকে প্রতিমার পাশে বসিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। সালঙ্কারা বেনারসী শাড়ি-পরিহিতা একটি জলজ্যান্ত কুমারীকে সাক্ষাৎ মা দুর্গাজ্ঞানে পূজা করে সকলের মধ্যে মাতৃভাবেরই সঞ্চার করা হয় সেই সময়। এই পূজা দেখতে ঐদিন বেলুড় মঠে খুব ভিড় হয়।

দুর্গাপূজার সঙ্গে কুমারী পূজার বিধান সম্ভবত তান্ত্রিক মত। দেবী দুর্গা স্বয়ংসম্পূর্ণা, পরমানন্দরূপিণী। তিনি কারো গর্ভজাত নন, অসুর নিধনের জন্য দেবগণের পুঞ্জীভূত তেজ থেকেই তাঁর জন্ম, সুতরাং

** দেশ পত্রিকায় ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সংখ্যায় বর্তমান লেখকের 'বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা' প্রকাশিত হওয়ার পর বহুজন কৌতূহলী হয়ে এই পূজা সম্বন্ধে লেখককে এবং 'দেশ' পত্রিকায় চিঠি দেন। পাঠকের আগ্রহাতিশয্যে লেখক পরের বছর (১৯৯১) শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় 'শ্রীমা ও বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (প্রকাশক — সাহিত্যলোক, কলকাতা—৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেই সময় নিউ দিল্লী থেকে শ্রীসুবল গাঙ্গুলী স্বামীজীর কুমারী পূজা বিষয়ে কয়েকটি আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ করেন একটি চিঠিতে। চিঠিটি 'দেশ' পত্রিকায় (১০ নভেম্বর ১৯৯০ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। তারই কিছু অংশ — 'দেশ' ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নব্বই বছর আগে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের সুলিখিত প্রবন্ধটিতে বহু তথ্য জানা গেল। ...বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা ও কুমারী পূজা সম্বন্ধে ভীষণ ভক্তি ও আগ্রহ ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর অপরিচিত পরিব্রাজক হিসাবে যখন নরেন্দ্রনাথ উত্তর ভারতে ভ্রমণরত, তখন গাজীপুরে (উত্তর প্রদেশে) বিখ্যাত রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের গৃহে কিছুদিন (সম্ভবত*

'জ্যান্ত দুর্গা' কুমারী রূপে পূজিতা

তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে, দেবী চণ্ডিকা এক কুমারী কন্যারূপেই দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন—"কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ"।

কুমারী পূজা বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তন্ত্রসারে আছে, এক থেকে ষোল বছর পর্যন্ত বালিকাদের কুমারীপূজার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাদের ঋতুমতী হওয়া চলবে না। এক-এক বছরের কুমারীদের এক-এক রকম নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন এক বছরের কন্যাকে বলা হয় 'সন্ধ্যা', দু-বছরের কন্যা 'সরস্বতী', তিন বছরের 'ত্রিধামূর্তি', চার বছরের 'কালিকা', পাঁচ বছরের 'সুভগা', ছ-বছরের 'উমা', সাত বছরের 'মালিনী', আট বছরের 'কুব্জিকা', নয় বছরের কুমারী 'কালসন্দর্ভা', দশ বছরের 'অপরাজিতা', এগার বছরের 'রুদ্রাণী', বারো বছরের 'ভৈরবী', তেরো বছরের 'মহালক্ষ্মী', চোদ্দ বছরের 'পীঠনায়িকা', পনের বছরের 'ক্ষেত্রজ্ঞা' এবং ষোল বছরের কুমারীর নাম 'অম্বিকা'।

১৮৮৯—৯০) আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এই অপরিচিত সাধু সেই সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গগনচন্দ্র রায়ের বালিকা কন্যা মণিকা রায়কে কুমারী পূজা করেন বলে লিখিত আছে। পরবর্তী কালে এই মণিকা রায় লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার (১৯২৩) ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী মণিকা চক্রবর্তী হিসাবে পরিচিতা হন। দিলীপ কুমার রায় তাঁর ইংরেজী 'যোগী কৃষ্ণপ্রেম' (১৯৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন এই মহিলা প্রকাশ্য পার্টিতে সেই যুগে মদ ও সিগারেট খেতেন। অথচ তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কেউ জানতেন না। দিলীপ কুমার রায়ের মতোই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপক রোনাল্ড নিক্সন মণিকাদেবীর আসল পরিচয় পান, এবং ১৯২৮ সালে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'যোগী কৃষ্ণপ্রেম' হিসাবে সর্বভারতে পরিচিত হন। সেই ব্রিটিশ যুগের ভাইস চ্যান্সেলারের স্ত্রী মণিকাদেবী স্বামী পুত্র সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে দীক্ষা নিয়ে যশোদা-মা হিসেবে পরিচিতা হন এবং আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে দুর্গম মীরটোলা পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রম স্থাপন

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীকে ভগবতীর অংশ বলেছেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করা সেই মাতৃভাবেরই দ্যোতক, এবং এইভাবে সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীরূপিণী জগন্মাতার শ্রীচরণে তাঁর সর্ববিধ সাধনার ফল সমর্পণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলতেন,—'মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব।' কুমারীর মধ্যে দৈবীভাবের প্রকাশ দেখা বা তাকে জননীরূপে পূজা করা সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় কুমারী পূজার অনুষ্ঠান তারই শাস্ত্রীয় ও বাস্তবায়িত রূপ। অন্য অর্থে আগেও বলা হয়েছে, বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা তত্ত্বত 'জ্যান্ত দুর্গা'রই পূজা। চিন্ময়ী সারদারূপিণী জগন্মাতার সতত অধিষ্ঠান সেখানে এবং এ তত্ত্ব 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'।

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা সেইরকমই একটি স্বর্গীয় ছবি। একবার বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় প্রতিমার সামনে শ্রীমা সারদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে

করে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটান। তাঁর মানসপুত্র কৃষ্ণপ্রেমও (মৃত্যু ১৯৬৫) মীরটোলা আশ্রমে যশোদা-মার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন আগে আলমোড়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত বিশাল গৃহ, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বশী সেনের গৃহ যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আছে, আর আছে বহু গ্রন্থ যার মধ্যে কিছু গ্রন্থ আলমোড়া থাকাকালীন উদয়শঙ্কর উপহার দিয়েছিলেন, সেইসব দেখে আসি। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য সেইসব গৃহ, সংরক্ষিত রাস্তা, সেই প্রস্তরখণ্ড যার ওপর ক্ষুধিত অপরিচিত নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেইসব দেখার পর সুদূর মীরটোলা আশ্রমে যাই। ...মীরটোলা আশ্রমে যেসব বিদেশীরা এখন যশোদা-মার আশ্রম খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে চালাচ্ছেন, তাঁরা যশোদা-মার অতীত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখেন না। সেই স্থানে দীর্ঘদিন বসবাসকারী এক আইরিশ ভদ্রলোক (বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক) আমার কাছেই সর্বপ্রথম শুনলেন যশোদা -মার জীবন-ইতিহাস। অত্যাধুনিকা মণিকা চক্রবর্তীর যশোদা-মা হিসেবে পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয়ই ছিল বাল্যকালে অপরিচিত পরিব্রাজক বিবেকানন্দের গাজীপুরে কুমারী পূজা। সাক্ষাৎ শিব ছিলেন স্বামীজী। তাঁর স্পর্শে তাঁর দৃষ্টিপাতে কত যুগান্তকারী ঘটনা এদেশে, বিদেশে ঘটে গেছে তা এখনো বহু অজ্ঞাত।

দেখে ভাববিহ্বল হয়ে স্বামী শিবানন্দজী (তখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন—(শ্রীমাকে দেখিয়ে) ''এই আমাদের মা, (এবার প্রতিমা দেখিয়ে) এই তাঁর পূজা হচ্ছে।''

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্বপ্নদর্শন

এই পূজায় উৎসব মুখরিত দিনগুলিতে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দেরও উপস্থিতি তাঁর প্রিয়জন ও গুরুভ্রাতারা উপলব্ধি করতেন। তাঁদেরই একজন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। তিনি স্বামীজীর বড়ই প্রিয় ও অনুগত ছিলেন। ডাক নাম গঙ্গাধর ছিল বলে স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন 'গ্যাঞ্জেস' বলে। তিনি প্রথম থেকেই স্বামীজীর বহুজনহিতায় সেবাধর্ম ও কর্মযজ্ঞের অন্যতম উদ্যোক্তা। সেবার সম্ভবত ১৯৩৩ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দজী বেলুড় মঠে এসেছিলেন দুর্গাপূজা উপলক্ষে। পূজার কদিন ভোর রাতে স্বামীজীর ঘরের কাছে বসে (এই ঘরেই স্বামীজী মহাসমাধিলাভ করেন) শ্রীদুর্গানাম করতেন, জিজ্ঞাসিত হয়ে বলতেন—''স্বামীজীকে শোনাচ্ছি।'' এইবারই ষষ্ঠীর দিন রাতে অখণ্ডানন্দজী স্বপ্ন (না সত্য!) দেখেন যেন স্বামীজী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন—''গ্যাঞ্জেস! আমার কাপড়-চোপড়ে ন্যাপথলিনের গন্ধ কেন রে? আমাকে আজকের দিনে নতুন কাপড় দিবি না?'' চকিতে অখণ্ডানন্দজীর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ মন্দিরের পূজারী মহারাজকে ডেকে তুললেন, বললেন— ''শিগগির নতুন কাপড় নিয়ে এসো।'' স্বামীজীর ঘর খুলে ধূপ জ্বালানো হলো। পূজারী আনীত সেই নতুন কাপড়ে স্বহস্তে অগুরু ছিটিয়ে তা স্বামীজীকে নিবেদন করলেন তাঁর চিত্রপটে। পূজারীকে বললেন — 'মঙ্গলারতি কর।' বিস্মিত পূজারী বললেন—'মহারাজ, এখন রাত আড়াইটে।' অখণ্ডানন্দজীর আনন্দিত কণ্ঠ—''আজ আড়াইটেই চারটে মনে করো।'' মঙ্গলারতি শেষে পূজারী সব শুনে অখণ্ডানন্দজীর চরণে প্রণত হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন—

"মহারাজ আমাদের কেন এরূপ দর্শন-শ্রবণ হয় না? আশীর্বাদ করুন যাতে আমাদের এরূপ হয়।"[১২]

আসবে কত দণ্ডী, জটাজূটধারী

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা করা এই প্রথম ও শেষবার। কারণ স্বামীজী এরপর আর কয়েকমাস মাত্র মর্তধামে ছিলেন। ১৯০২ সালে ৪ জুলাই তিনি বাঞ্ছিতলোকে প্রস্থান করেন। কিন্তু বেলুড় মঠে তাঁর অভিলষিত দুর্গাপূজা তাঁর গুরুভ্রাতা ও অনুগামীদের দ্বারা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সেই সময় কোন কোন বছর অনিবার্যকারণে প্রতিমার বদলে ঘটে ও পটে যথাবিধি এই পূজানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হতো। স্বামীজীর পরে স্বামী প্রেমানন্দজীই মঠে দুর্গাপূজা করার অন্যতম উদ্যোক্তা। স্বামীজীর যে ইচ্ছা ছিল —

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী, জটাজূটধারী।।"—

স্বামীজীর প্রিয় বিল্বতরুমূলে পরবর্তী কালে সে চিত্রও পাওয়া যায়। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্মৃতি — "এখানে কত অপরিচিত যোগী জটাধারীকে বসিয়া ধ্যান এবং কয়েকদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দজী) তত্ত্বাবধানে সানন্দে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখা যাইত।"[১৩]

প্রেমানন্দ ও সারদানন্দের মাতৃবন্দনা

১৯১২ সালে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় শ্রীমা সারদামণি উপস্থিত। বোধনের দিন 'জ্যান্ত দুর্গা' আসবেন, তাই প্রেমানন্দজীর দারুণ ব্যস্ততা।

মঠের প্রবেশদ্বার মঙ্গলঘট ও কলাগাছ তখনো সুসজ্জিত হয়নি দেখে তিনি খুবই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—"এসব এখনো হয়নি, মা আসবেন কী?" তাঁর নির্দেশে অবিলম্বেই সেসব করা হলো এবং দেখা গেল দেবীর বোধনের ঠিক সময়েই শ্রীমায়ের গাড়ি মঠে এসে ঢুকছে। দ্রুতপদে গাড়ির কাছে গিয়ে প্রেমানন্দজী-প্রমুখ গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে নিজেরাই সে গাড়ি টেনে আনলেন মঠের ভিতরে। শ্রীমার সঙ্গিনী, গোলাপ-মা শ্রীমাকে হাত ধরে নামালেন। প্রথমেই শ্রীমা বললেন—"সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজে-গুজে মা দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।"[১৪]

সেবার পূজায় শ্রীমা বেলুড় মঠে মোট ছ-দিন ছিলেন, ষষ্ঠী থেকে একাদশী পর্যন্ত। অষ্টমীর দিন সমাগত অজস্র মানুষ শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম করলেন, কয়েকজন শ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষাও নিলেন। নবমীর দিনটিও সার্থক হয়ে ওঠে শ্রীমায়ের আশীর্বাদে। সঙ্গিনী গোলাপ-মা ঐদিন একসময় এসে উপস্থিত সারদানন্দজী, প্রেমানন্দজীকে শ্রীমায়ের আশীর্বাদ বাণী জানিয়ে গেলেন, বললেন—"শরৎ, মা-ঠাকরুন তোমাদের সেবায় খুব খুশি তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।" সে আশীর্বাদের তড়িৎ কম্পনে উল্লসিত শরৎ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দজী বাবুরাম মহারাজকে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে উঠলেন—"বাবুরাম-দা, শুনলে?"[১৫]

মর্তলোকে এর চেয়ে আর বেশি সার্থকভাবে কিভাবে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে? এবার মহাষ্টমী রাত্রে বেলুড় মঠে 'জয়া' নাটক এবং বিজয়া দশমীর রাতে 'রামাশ্বমেধ-যজ্ঞ' যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীমা খুবই আগ্রহ নিয়ে মঠের দোতলায় বসে এসব অনুষ্ঠান দেখেছিলেন। এবারই বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় গঙ্গায় একটি মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। ভক্ত ডাক্তার কাঞ্জিলাল গঙ্গাবক্ষে নৌকার ওপর দেবীর সামনে নানা মুখভঙ্গি ও রঙ্গব্যঙ্গ করে সকলকে হাসাচ্ছিলেন। দেবীর

সামনে এ-ধরনের রঙ্গব্যঙ্গ করায় জনৈক ব্রহ্মচারী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শ্রীমা কিন্তু নিজের ঘরে থেকে বিজয়ার সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ করেছিলেন এবং এই সময় জনৈক সাধু ক্ষুব্ধ ব্রহ্মচারীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শ্রীমা বললেন— "না না এসব ঠিক। গান-বাজনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, এইসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।" আর একবার মহাষ্টমী পূজার দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১০৮টি পদ্ম ফুল দিয়ে শ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করেছিলেন। একবার মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হচ্ছে। শ্রীমাও সেবার উপস্থিত, বাস করছেন তথাকথিত লেগেট হাউসে অর্থাৎ মঠের উত্তর দিকের বাগান-বাড়িতে। অষ্টমীর সন্ধিপূজার ব্যবস্থাপক সারদানন্দজী জনৈক ব্রহ্মচারীকে বললেন—"এই গিনিটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আয়।" ব্রহ্মচারী দ্বিধান্বিত হয়ে ভাবছেন দেখে সারদানন্দজীই তাঁর সংশয় দূর করে বললেন—"ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয় । এখানে তো তাঁরই পূজা হলো।"[১৬]

১৯১৬ সালের মঠের দুর্গাপূজাতেও শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন, সপ্তমীর দিন থেকে ঐ বাগান-বাড়িতে বাস করতে থাকেন, সঙ্গে ছিলেন রাধু বা রাধারানী প্রমুখ তাঁর আশ্রিতজনেরা। এবার অষ্টমীর দিনে শ্রীমা সকালবেলা প্রতিমা দর্শন করতে এসে একবার মঠের রান্নাঘরেও যান। সেখানে দেখেন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা এসে মিলিতভাবে তরকারি কাটছেন। তিনি হাসিমুখে বললেন—"ছেলেরা তো বেশ কুটনো কাটে।" জনৈক সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে জানালেন—"ব্রহ্মময়ীর (অর্থাৎ শ্রীমায়ের) প্রসন্নতালাভই উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক কি কুটনো কুটেই হোক।" সে কথা শুনে সুপ্রসন্ন হাসিতে শ্রীমায়ের আশীর্বাদধারা ঝরে পড়ে। সেবার পূজাতেই পালিতা কন্যা রাধু, কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রীমা বিজয়া দশমীর আগেই কলকাতায় ফিরে যেতে চান। সেকথা জেনে

জনৈক হতাশ সন্ন্যাসী প্রেমানন্দজীকে বললেন শ্রীমাকে অনুরোধ করতে যাতে তিনি পূজার বাকি ক-দিন মঠে উপস্থিত থাকেন। তা শুনে সভয়ে প্রেমানন্দজী দু-হাত জোড় করে সন্ন্যাসীকে বললেন—"মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে—তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কী করবে? তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করবেন।"[১৭] যাই হোক, পরে রাধারানী কিছুটা সুস্থবোধ করলে শ্রীমা পূজার বাকি কটা দিন মঠেই থেকে গেলেন এবং সন্তানদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

শিবানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' বন্দনা

১৯১৬ সালের বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার একটি প্রাণবন্ত চিত্র পাই তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত স্বামী শিবানন্দজীর একটি পত্রে। তিনি লিখেছিলেন—"প্রিয় হরি মহারাজ, আমার ও বাবুরাম মহারাজের ও মঠস্থ সকলের বিজয়ার নমস্কার আলিঙ্গনাদি জানিবে। বাবুরাম মহারাজের পত্রে এখানকার পূজার বিস্তারিত সংবাদ সমস্তই জ্ঞাত হইয়া থাকিবে। আমি মঠে প্রতিমায় মহামায়ার আরাধনা কখনো দেখি নাই। অবশ্য আরো দুইবার হইয়াছিল। এবার শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন প্রত্যক্ষরূপে হইল—অনুমানের আর প্রয়োজন ছিল না। প্রতিমাখানি অতি সুশ্রী ও সুগঠিত হইয়াছিল। পূজারী ও তন্ত্রধারক দুইটি ব্রহ্মচারী। যুবক তন্ত্রধারকটি সুপণ্ডিত ও গ্রাজুয়েট। পূর্বে কোন সরকারী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিল। এখন শ্রীশ্রীমার কৃপালাভ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়া মঠে আছে। পুরোহিত যুবকটি তাহাদের নিজের বাটীতে কয়বার দুর্গাপূজা করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অনেক বিষয় জানা আছে। অতি সুন্দর পূজা করিয়াছে। ছেলেগুলি ভূতের মতো পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাদের চেষ্টাতেই পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও তিন দিন অনবরত বৃষ্টি ঝড়, তথাপি মায়ের কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন কি, ভক্তেরা যে

সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য! পরে যোগেন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল—অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন—"তাই তো, এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতাটাতা সব যে ভেসে যাবে! মা, রক্ষা কর।" মা সত্য সত্যই রক্ষা করিতেন; তিন দিনই ঐ রকম। তিন দিনে প্রায় ৪ হাজার লোক প্রসাদ পাইয়াছে (দু-বেলা ধরিয়া)।

"বিজয়ার দিন মা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা আসিয়া বরণাদি সব করিলেন। তারপর ছেলেরাই সব প্রতিমা লইয়া দু-খানা নৌকা জুড়িয়া তাহার উপর বসাইয়া একবার উত্তরদিকে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত, তারপর ফিরিয়া দক্ষিণে লালাবাবুদের সায়ের পর্যন্ত ও তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া মঠের ঘাটে প্রতিমা জলমগ্ন করিল।"[১৮]

১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধিলাভ হলে অর্থাৎ চিন্ময়ী শ্রীমা তাঁর মৃন্ময় ঘট ভেঙে দিয়ে অর্থাৎ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেও সূক্ষ্মদেহে আজও তিনি বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকেন বলেই ভক্তগণের বিশ্বাস এবং আগেও বলা হয়েছে এ পূজা আজও তাঁর নামেই 'সঙ্কল্পিত' হয়। এ পূজার অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানেই।

আগমনী গান ও কাঠামো পূজা

প্রতি বছর একই কাঠামোর ওপরে বেলুড় মঠের প্রতিমা তৈরি হয়। দশমীর দিনে গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জনের পরে কাঠামোটি আবার তুলে রাখা হয় পরের বছর প্রতিমা গড়ার জন্য, এবং প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর

দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কাঠামোটি পূজা করে তাতে নতুন প্রতিমা গড়ার প্রথম মাটি দেওয়া হয়। যেহেতু জন্মাষ্টমীর দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহামায়া একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। প্রতিমা গড়া হয় বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণেই। আগেই বলা হয়েছে, এ পূজা করায় সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। তাই জনৈক ব্রহ্মচারীই প্রতি বছর নির্ধারিত হন এই পূজা করার জন্য। আর যে ব্রহ্মচারী কাঠামো পূজা করেন, সাধারণত তাঁরই ওপর দায়িত্ব পড়ে দুর্গাপূজা করারও। শোনা যায়, অতীতে জন্মাষ্টমী তিথি থেকেই মঠে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা দেবীর আবাহনের জন্য আগমনী গান নিত্য গাইতেন। পরবর্তী কালে যে সময় পিতৃপক্ষের তর্পণ শুরু হয় অর্থাৎ প্রতিপদ তিথি থেকেই অথবা মহালয়ার দিন থেকে নাটমন্দিরে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের যেস্থানে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই নিত্য আগমনী গান গীত হয় সাধু-ব্রহ্মচারীদের দ্বারা এবং সেই ধারা আজও চলে আসছে।

দুর্গাপূজার সময়-নির্ঘণ্ট

বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার শতবর্ষ প্রায় সমাগত। যদিও পূজার অনুষ্ঠানাদি আজও সবই ঐতিহ্যানুসারী, তবে নানা দিক থেকে সেকাল-একালের পার্থক্যও বড় কম নয়। বিশেষত ভক্ত সমাগম ও আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে। এখন বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় কয়েক লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এই মহাপূজার আয়োজনের খরচও তাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন আয়-ব্যয়ের হিসাবেও প্রতি বছর লক্ষাধিক টাকা ছাড়িয়ে যায়। সব টাকাটাই কিন্তু সংগৃহীত হয় পূজার প্রণামী বাবদ জনসাধারণের কাছ থেকেই। প্রতি বছর ভারতের বাইরে থেকে বহু বিদেশীও আসেন বেলুড় মঠের পূজা দেখতে।

একালে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার সময়-সূচীর একটি সুন্দর তালিকা বা নির্ঘণ্ট মুদ্রিত করে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। প্রতি

বছর একই ধারায় প্রকাশিত এই তালিকার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো —

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া

শ্রীশ্রীদূর্গা পূজার সময়-নির্ঘণ্ট

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকানুযায়ী)

১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯৯৬

পঞ্চমী ঃ ৩১ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীদেবীর বোধন ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধারতির পর।

ষষ্ঠী ঃ ১ কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর, শুক্রবার—সকাল ৬টায় শ্রীশ্রীদেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ।
সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর শ্রীশ্রীদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

সপ্তমী ঃ ২ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর শনিবার—সকাল ৫-৪০ মি. শ্রীশ্রীদেবীর সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ।

মহাষ্টমী ঃ ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর, রবিবার—সকাল ৫-৪০ মি. শ্রীশ্রীদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজারম্ভ।

কুমারী পূজা ঃ সকাল ৯-১৫ মি. (মন্দিরের পশ্চিম চত্বরে)

সন্ধি-পূজা ঃ সকাল ১০-১০ মি. গতে পূজারম্ভ
এবং ১০-৫৮ মি. মধ্যে পূজা সমাপন।
[১২টায় প্রসাদ বিতরণ (হাতে হাতে)]

মহানবমী ঃ ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর, সোমবার—সকাল ৫-৪০ মি. শ্রীশ্রীদেবীর মহানবমীবিহিত পূজারম্ভ।
ভোগারতির পর হোম।

দশমী ঃ ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর, সোমবার — সকাল ৮-৩০ মি.
শ্রীশ্রীদেবীর দশমীবিহিত পূজারম্ভ।
সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর প্রতিমা-নিরঞ্জন ও শান্তিজল।

বিঃ দ্রঃ - পুষ্পাঞ্জলি—প্রত্যহ শ্রীশ্রীদেবীর মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর।
(অঞ্জলির জন্য পুষ্প-বিল্বপত্রাদি সঙ্গে আনা বাঞ্ছনীয়)
শ্রীশ্রীদেবীর সন্ধ্যারতি—প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর।

পূজার উপকরণ ও বলি-প্রদান

দুর্গাপূজাকে বলা হয় কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই পূজার উপকরণের সমারোহও তাই বিরাট, বিশেষত বেলুড় মঠের ফিরিস্তি শুনলে তাই মনে হয়। চারদিনের পূজার ফুল-ফল-নৈবেদ্য-ভোগরাগ ছাড়াও এতে বহু জানা-অজানা এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসেরও প্রয়োজন হয় উপকরণ-উপাচার হিসাবে। সাধারণত ভুবনেশ্বরের বিন্দু-সরোবরের জল সংগ্রহ করে দেবীর স্নানাভিষেক সম্পন্ন হয়। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদের জল, গঙ্গা জল, শিশির জল, সুগন্ধি জল, স্বর্ণ জল, রৌপ্য জল প্রভৃতিতেও দেবীর স্নানাভিষেক হয়। নানাস্থানের পনের রকমের মাটিও লাগে এই পূজায়, যার মধ্যে বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকাও পড়ে। পুরাণে উল্লিখিত সেইসব মাটি, যথা—গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, পর্বতমৃত্তিকা, নদ, নদী ও সাগরের মৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, অশ্বদন্তমৃত্তিকা, দেবদ্বারমৃত্তিকা,

সরোবরমৃত্তিকা ও যজ্ঞশালামৃত্তিকা। আগেই বলা হয়েছে, স্বামীজীর সময়েই বেলুড় মঠে পশুবলিপ্রদান নিষিদ্ধ হয় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে। পরিবর্তে আখ, শশা ও চালকুমড়া বলিপ্রদত্ত হয় নবমীতে এবং সন্ধিপূজাতে বলির উপকরণ শুধুমাত্র একটি কলা।

সানাই, ঢাক, ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টা

বেলুড় মঠের পূজায়, ঢাক-ঢোলের বাদ্যি বাজে বোধনের দিন থেকেই, সেই সঙ্গে থাকে কাঁসরের কাই-না-কানা-কাই-না-কানা আওয়াজ—দেবীপূজার আনন্দচ্ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে অগণিত মানুষকে মাতায় এই অখ্যাত মানুষ কটি। এরাও বেলুড় মঠে আমন্ত্রিত হয় প্রতি বছর। এঁদের মধ্যে ঢুলি পঞ্চানন হাজরার বংশধররা পুরুষানুক্রমে আসছেন গত পঞ্চাশ বছর ধরে। বেলুড় মঠের নহবতও ঐতিহ্যমণ্ডিত। ষষ্ঠী বা দেবীর বোধনের দিন থেকেই সানাইয়ের সুমধুর ঐকতান বেলুড় মঠের বায়ুমণ্ডল প্লাবিত করে।

শালগ্রাম শিলা (নারায়ণ) পূজা

পঞ্চমী তিথিতে বেলুড় মঠের নিকটবর্তী জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে শালগ্রাম শিলা আনা হয় ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে এবং যথারীতি দেবী পূজার সময় ভোগরাগের সঙ্গে নারায়ণ শিলারও পূজা হয় এবং দশমীতে যথাবিহিত ভোগরাগের পর আবার ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে শালগ্রাম শিলা জগন্নাথ দেবের এই মন্দিরে রাখা হয়। এইসময় শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির থেকে নিত্যপূজিত শিবলিঙ্গও পূজামণ্ডপে আনা হয় এবং পূজার কয়দিন যথাবিহিত ভোগরাগের পর শালগ্রাম শিলার সঙ্গেই দিয়ে আসা হয়। এছাড়া সপ্তমীর দিন সকালেও ঢাক, ঢোল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের ঘাটে নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আনা হয়।

সন্ধি পূজায় দেবীর আরতি

প্রসাদ বিতরণ

বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণও একটি ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। একসময় সকলকে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ধনীর সঙ্গে দরিদ্র-ভিখারী-অনাথ-আতুর কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। এ ব্যাপারে কোন বছরই ছেদ পড়েনি, এমনকি পঞ্চাশের মন্বন্তরেও। তখন বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিরজানন্দজী। স্বামী বিবেকানন্দের পরম স্নেহভাজন এই সন্ন্যাসী-শিষ্য ছিলেন বিবেকানন্দ-আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্যাগ-তপস্যার এক সমুজ্জ্বল বিগ্রহ। সেই দুর্ভিক্ষের বছরে শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে তিনি এক চিঠিতে নির্দেশ দেন—"এবারও ঘটে ও পটে পূজার আয়োজন হচ্ছে জেনে সুখী হলুম। পূজা বাবদ যতদূর সম্ভব কম খরচ করে (আন্দাজ ২০০-৩০০ টাকা) বাকি টাকা মঠে আগত, তা সে যত সংখ্যাই হোক—দুঃস্থ, বুভুক্ষু, অনাথ-আতুরদের খাওয়াতে ব্যয় করবে। কেউ যেন নিরাশ হয়ে ফিরে না যায়। শুধু খিচুড়ি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা হবে। তাতেই শাক-সবজি যা কিছু দেবে। অন্য তরকারি মিষ্টান্ন কিছু দরকার নেই। এ খিচুড়ি মায়ের সামনে হাণ্ডা হাণ্ডা করে বিরাট ভোগ দিয়ে তারপর সর্বহারা নারায়ণদের পরিবেশন করতে হবে। এইবার মা এইভাবে পূজাভোগ গ্রহণ করবেন ও আমাদের পূজা সার্থক হবে। আলাদা ব্যবস্থা কারো জন্য নয়।"[১৯]

তবে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব বলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে প্রসাদ পান।

বিজয়া দশমী

নবমী নিশি পোহালেই বিজয়া দশমী। বেলুড় মঠের আনন্দ-মুখরিত চারটি দিনের পরিসমাপ্তি বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সন্ধ্যায়

যথারীতি পূজক ও তন্ত্রধারকের দর্শনীয় সন্ধ্যারতি শেষে ভক্তবৃন্দের 'দুর্গামায়ীকী জয়'ধ্বনিতে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে দেবীকে বহন করে আনা হয় গঙ্গাতীরে 'শ্রীমায়ের ঘাটে', অনতিদূরে স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গা'ও নিত্য বিরাজিতা নিজ মন্দিরে। শ্রীমায়ের ঘাট এই সময় আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়। সেখানে অগণিত ভক্ত-সন্তানের মুহুর্মুহু 'দুর্গামায়ীকী জয়' ধ্বনির মাঝে জাহ্নবী সলিলে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়।

বিজয়া দশমীর সর্বশেষ অনুষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে সকলে দেবীর আশীর্বাদ-পূত শান্তিজল গ্রহণান্তে পরস্পরের আলিঙ্গন ও যথাযোগ্য প্রণামাদি। সকলে হাতে হাতে মিষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সেই আনন্দক্ষণে প্রতিমা-শিল্পী, ঢাকি-ঢুলি প্রভৃতিকেও কাপড়, শাড়ি, প্রসাদ, টাকা দিয়ে বিদায় জানানো হয়। গৃহী ও সন্ন্যাসীর এই মিলন-মেলাও দর্শনীয়। দেবীর মৃন্ময়ীরূপটি নিমজ্জিত হয়েছে, কিন্তু চিন্ময়ীরূপে তিনি নিত্য বিরাজিতা সকলের অন্তরে —

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতাঃ
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।

পরিশিষ্ট

১। দুর্গা ঃ মহাশক্তি ও মহামাধুর্যের প্রতীক

২। কুমারী পূজা কি ও কেন

৩। হিমালয় কন্যা উমা পার্বতী বা হৈমবতী

৪। দেশদেশান্তরে দুর্গা

পরিশিষ্ট — ১

দুর্গা ঃ মহাশক্তি ও মহামাধুর্যের প্রতীক

দুর্গাপূজাকে বলা হয় মহাপূজা। কিন্তু মূলত এই পূজা শক্তি-দেবতারই আরাধনা। 'চণ্ডী'তে আছে, দেবীর সঙ্গে যুদ্ধরত শুম্ভাসুর ঠাট্টা করে বলছেন ঃ

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী।।" (১০/৩)

—বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গে ! তুমি গর্ব করো না। কারণ, অন্যান্য দেবীর শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে অতি গর্বভরে তুমি যুদ্ধ করছ।

শুম্ভাসুরের এই উক্তিতে দেবী বললেন ঃ

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।।" (১০/৫)

—দুষ্ট! জগতে আমিই এক ও অদ্বিতীয়া। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ আমারই বিভূতিরূপিণী সমস্ত দেবী আমাতেই লয় হয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর দেবী বললেন ঃ

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।" (১০/৮)

—আমারই বিভূতিতে আমি যে নানা রূপে বর্তমান ছিলাম। দেখ, সেই সমস্ত রূপ আমি আবার আমার শরীরে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আমি এখন একাই রয়েছি। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

চণ্ডীর মতে, সব দেবতার শরীর থেকে বিকীর্ণ পুঞ্জীভূত অতুলনীয় তেজোরাশি একত্র হয়ে যে-নারীমূর্তি রূপ পরিগ্রহ করে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করেন তিনিই দেবী। কিন্তু নারীরূপে কেন? কারণ, নারী শক্তির প্রতীক। সকল দেবতার শক্তিই নারীরূপে প্রকাশিতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঃ ''দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁহার শক্তি। তাঁহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বহন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।''

মহিষাসুরমর্দিনীর নারীরূপ দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিরই প্রতীক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ও অদ্বিতীয় এই শক্তিই বর্তমান। বেদের ব্রহ্ম ও শক্তি, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের জড় (MATTER) ও শক্তি (ENERGY) তত্ত্বের দিক থেকে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তন্ত্রের শিব ও কালী-ভাবনায় সেই এক তত্ত্বেরই আভাস। অলৌকিক দেব-দেবী ও লৌকিক পুরুষ-স্ত্রী, পতি-পত্নী সবই এই তত্ত্বের মধ্যে পড়ে। রাধাকৃষ্ণলীলাও সেই এক তত্ত্ব। নারীর মোহিনীরূপ, স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব সবই সেই 'দেবাত্মশক্তি'র বহিঃপ্রকাশ। স্বর্গরাজ্য পুনরধিকারের পরে অহঙ্কৃত দেবতাদের দর্পচূর্ণ করেন স্বয়ং ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপরিচয় না দিয়ে 'উমা হৈমবতী'র মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেন।

মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরনিধনে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তিই মহাশক্তি দুর্গারূপে প্রকটিতা। 'চণ্ডী'তে বর্ণিত দুর্গা প্রধানত শক্তির মাতৃরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ বা প্রলয়-তত্ত্বেও এই মাতৃরূপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যেমন সৃজন, পালন ও রক্ষা করেন, নিধনকারিণী শক্তিও তাঁরই। বাংলার শাক্ত পদাবলীগুলিতে এই সৃষ্টি-

স্থিতি-বিনাশকারিণী দেবী সম্পর্কিত অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; যেখানে মা কালীর পদতলে শায়িত শিবকে 'শিব'রূপে নয়, অনেক ক্ষেত্রে 'শব' রূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুর্গা অসুরকে পদতলে পিষ্ট করছেন, নিহত অসুর দেবীর পাদস্পর্শে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁর দেবত্বের বিকাশ হয়েছে—শুভবুদ্ধি জ্ঞান ও চৈতন্যের উদয় হয়েছে। একটি প্রচলিত রামপ্রসাদী গানে আছে ঃ

"শিব নয় মায়ের পদতলে
ওটা মিথ্যা লোকে বলে ।।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়িয়ে তার উপরে।
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে ।।"

এই সাত্ত্বিক দৃষ্টিটি বড় সুন্দর ও তাৎপর্যময়। অর্থাৎ শক্তিরূপিণী মায়ের কৃপায় অতি দুর্জন বা আসুরিক প্রকৃতির লোকও শিবত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন। আবার দেবাসুরের যুদ্ধ তো কেবল বাইরে নয়, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতেও চলছে অবিরাম এই সুরাসুরের সংগ্রাম। মানুষ বা দৈত্য বা দানব সকলের মধ্যেই দেবত্ব বা শিবত্ব সবসময়ই বিরাজ করছে এবং স্বরূপত সে শিবই। কিন্তু তার ভিতরের আসুরিক ভাব এই শিবত্বকে ঢেকে রেখেছে। শক্তিরূপিণী এই মায়ের কৃপা হলে ভিতরের আসুরিক ভাব চলে গিয়ে আবার তার 'শিবত্ব' প্রাপ্তি হবে। তখন মানুষ বা অসুর—যে নামেই আখ্যাত হোক না কেন, সে তার স্বরূপ দেবত্ব লাভ করবে। জীবের অন্তঃকরণে সুরাসুরের এই সংগ্রাম ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক লুই স্টিভেনসন সৃষ্ট দুটি চরিত্র ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুটি দ্বান্দ্বিক চরিত্রের অন্তরালে মানুষের

অন্তঃকরণে সুরাসুর বা দেবত্ব ও পশুত্বের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

জীব স্বরূপত শিবই। জীবের অন্তর্নিহিত পশুত্বের বিনাশের পর দেবতার জাগরণ হয়। সুতরাং দেবতা বিরাজ করেন বহির্জগতে নয়—অন্তর্জগতেই। সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের জন্য মানুষই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী দেবতা সৃষ্টি করে। প্রাচীন পুরাণে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যা যে সমকালের পৃথিবীর জনসংখ্যা নয়, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে?

শিব, দুর্গা ও কালী নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার সুন্দর ধ্যান-ধারণার কথা আমাদের জানা আছে। একবার তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্ধবীকে লেখেন ঃ "কালী সম্বন্ধে একটা নতুন ভাব মনে জেগেছে। মায়ের পদতলে শায়িত শিবের ঢুলুঢুলু চোখ দুটি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কি করে তাই দেখছিলাম। কালী ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়াল রেখে সাক্ষিরূপে তিনি দেখছেন দেবাত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন চলছে, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্য? অর্থাৎ মানুষই কি দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হালকা ওড়নায় ঢাকা।"

কে এই 'লাস্যময়ী' নারী? দুর্গা, কালী প্রভৃতি যে-নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন, ইনিই সেই মহাশক্তির প্রতীক। নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ মহা বৈদান্তিক হয়েও ঈশ্বরের এই শক্তিরূপিণী অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলতেন ঃ "দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে — 'কালী' বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত

করে ।—আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী —ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনই হয় ... ।''

কালী-ব্রহ্মের এই ধন্দে পড়েই বোধহয় সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ ''আমি কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।''

এই দ্বন্দ্বের নিরসন আছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ ''ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একক মানলেই আরেকটি মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি, অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না ।...

''আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তারই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপ ভেদ।''

তন্ত্র ও পুরাণে দুর্গা ও কালীকে আদ্যাশক্তির দুই রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে 'চণ্ডী'তে একটি সুন্দর শ্লোক বলা হয়েছে ঃ ''চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।'' (৫।৮০) এই শ্লোকের দ্বারা দেবীকে পরব্রহ্মেরই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। দেবী পরমাপ্রকৃতি এবং পরব্রহ্মের সহিত অভিন্না। তাই তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। তবে যে মা দুর্গাকে 'হৈমবতী', 'উমা', 'পার্বতী' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়, এরই বা তাৎপর্য কী? দেবী দুর্গা স্বয়ংসিদ্ধা, কাজেই তিনি হিমালয়কন্যা 'হৈমবতী', 'উমা' বা 'পার্বতী' হবেন কী করে? এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, শুম্ভনিশুম্ভকে বধের জন্য দেবতারা হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করলে তাঁদেরই ইচ্ছাশক্তি বা তপঃপ্রভাবে দেবী রূপ পরিগ্রহ করেন এবং সেই

অর্থেই হয়তো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী সেই দেবীকে হিমালয় কন্যা বা 'হৈমবতী', 'উমা' বা 'পার্বতী' আখ্যা দেওয়া হয়।

তবে ভারতীয় জনমানসে দেবীর উমারূপটি বিশেষ প্রিয়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ "কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননীরূপে সৌন্দর্যে মাধুর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।"

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদে দুর্গার বিশেষ উল্লেখ নেই, তবে রুদ্র বা শিবের কথা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে যজুর্বেদে অম্বিকা নামটি পাওয়া যায়। এই অম্বিকা কিন্তু রুদ্রের পত্নী নন, ভগিনী। পরবর্তী কালে অবশ্য 'দুর্গ' কথার অনেক অর্থ দেখতে পাই। সেইসব অর্থের সাহায্যেই পুরাণাদিতে 'দুর্গা'র ব্যাখ্যা হয়েছে দেখা যায়। 'শব্দ-কল্পদ্রুম'-এ 'দুর্গা' শব্দের অর্থ এই ঃ

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।।
মহাভয়ে চাতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা।।"

—দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ শব্দ হন্তৃবাচক। এই সকলকে হনন করেন যে-দেবী তিনিই 'দুর্গা' নামে পরিকীর্তিতা।

আবার দেবী স্বয়ং 'চণ্ডী'তে বলেছেন ঃ

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।"

(১১/৪৯-৫০)

—'দুর্গম' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুরকে বধ করে আমি দেবী 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেবী একাধারে 'উমা', 'হৈমবতী' নামে যেমন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতীক, তেমনি 'দুর্গা' নামে আবার অশুভ ও অসুখ-নাশিনী মহাশক্তিরও প্রতীক। আসলে দেবী স্বয়ংসিদ্ধা (শিবকে পতিরূপে বরণ করে স্বয়ংবরাও বটেন)। তাই তাঁর পক্ষে অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মহাশক্তির অধিকারিণী হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। তিনি যেমন স্বয়ংসিদ্ধা বা স্বয়ংপ্রকাশিতা, শিবও তেমনি স্বয়ম্ভূ। সেই অর্থেই শিব ও পরমাপ্রকৃতি দেবী দুর্গা এক অভিন্ন সত্তা। তন্ত্রমতেও শিব ও শক্তি অভেদ। শিবরূপী পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট, তাঁর সকল ক্রিয়া ও প্রচেষ্টা দেবীরূপিণী মহাশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এখানে 'শক্তি' অর্থে ব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই বুঝতে হবে, যা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। তাই 'চণ্ডী'র মতে দেবীও স্বয়ং পূর্ণসত্তা, ব্রহ্মেরই ন্যায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। দেবী স্বমুখে সে-কথাই ঘোষণা করেছিলেন : ''একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'' (১০।৫) [২০]

(শারদীয়া 'উদ্বোধন', ১৪০৩)

আকর গ্রন্থ : (১) বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ); (২) শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য (সাহিত্য সংসদ); (৩) লিজেল রেমঁ : নিবেদিতা (অনুবাদ-নারায়ণী দেবী); (৪) শঙ্করীপ্রসাদ বসু : লোকমাতা নিবেদিতা, ১ম খণ্ড ১ম পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স; (৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : উদ্বোধন

পরিশিষ্ট—২

কুমারী পূজা কি ও কেন

মর্তলোকে গিরিরাজ বা হিমালয় কন্যা উমা অসুরদলনী — মহিষাসুরমর্দিনী এবং ভক্তজনের দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। তিনি আবার শিবকে পতিরূপে বরণ করে কৈলাসে ঘর-সংসারও পেতেছেন। প্রতি বছর শরৎকালে পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে চারটি দিনের জন্য তাঁকে পিতৃগৃহে বা মর্তে আসতে হয় ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করতে। এই চারদিনের একদিন তাঁকে কুমারীরূপেও পূজা করা হয় জলজ্যান্ত একটি কুমারীকে প্রতীক হিসাবে তাঁর পাশে বসিয়ে। কিন্তু কুমারী পূজার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ? মা হয়েও তিনি কি করে কুমারী হলেন? তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

কুমারী পূজা বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তন্ত্রসারে আছে, এক থেকে ষোল বছর পর্যন্ত বালিকাদের কুমারী পূজার জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে। কিন্তু অবশ্যই তাদের ঋতুমতী হওয়া চলবে না। এক-এক বছরের কুমারীদের এক-এক রকম নাম। যেমন, এক বছরের কন্যাকে বলা হয় ‘সন্ধ্যা’, দু-বছরের কন্যা ‘সরস্বতী’, তিন বছরের ‘ত্রিধামূর্তি’, চার বছরের ‘কালিকা’, পাঁচ বছরের ‘সুভগা’, ছবছরের ‘উমা’, সাত বছরের ‘মালিনী’, আট বছরের ‘কুব্জিকা’, নয় বছরের কুমারী ‘কালসন্দর্ভা’, দশ বছরের ‘অপরাজিতা’, এগারো বছরের ‘রুদ্রাণী’, বারো বছরের ‘ভৈরবী’, তেরো বছরের ‘মহালক্ষ্মী’, চোদ্দ বছরের ‘পীঠনায়িকা’, পনেরো বছরের কুমারী ‘ক্ষেত্রজ্ঞা’ এবং ষোল বছরের নাম ‘অম্বিকা’।

দুর্গাপূজার সঙ্গে কুমারী পূজার বিধান সম্ভবত তান্ত্রিক মত থেকে এসেছে। দেবী দুর্গা স্বয়ং সম্পূর্ণা পরমানন্দরূপিণী। তিনি কারো গর্ভজাত নন, মহিষাসুর বধের জন্য দেবগণের পুঞ্জীভূত তেজ থেকেই তাঁর জন্ম, সুতরাং তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে, দেবী চণ্ডিকা এক কুমারী কন্যারূপেই দেবতাগণের সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন— "কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।"

কুমারী পূজার ধ্যানমন্ত্রে আছে —

"বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালংকার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্।।
চারুহাস্যং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্।।"

দেবী ভগবতী এখানে কুমারীরূপেই ধ্যেয়। তাঁর কুমারীত্ব মানবীভাবে বোঝা দুঃসাধ্য। কারণ, তিনি দেবতাদের তেজঃ-সম্ভূতা। শিব-জায়া হয়েও তিনি কুমারী। "পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে উমা-পার্বতী শিব-জায়া হলেও প্রকৃতপক্ষে পুত্রকন্যার জননী নন। কার্তিকেয়ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র নন।"[২১] পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি লেখেন— "দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গাপূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে।"[২২]

তান্ত্রিক মতে কিন্তু সকল কুমারীই দেবীর প্রতীক। তন্ত্রসারে পাই— "কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎকুমারী নরদেবতা।" মহাষ্টমীতে কুমারী-পূজা অনুষ্ঠিত হলেও মহানবমীতে কুমারী পূজার বিধান তন্ত্রসারেও আছে। যেমন — "মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীং চ প্রপূজয়েৎ"।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীকে ভগবতীর অংশ বলেছেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করা সেই ভাবেরই দ্যোতক এবং

এই ভাবে সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীরূপিণী জগন্মাতার শ্রীচরণে তাঁর সর্ববিধ সাধনার ফল সমর্পণ করেন।

কুমারী পূজা খুবই ফলদায়ী। তন্ত্রসারে আছে ঃ

"হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবী ফলং কোটিগুণং ভবেৎ।।
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।।

অর্থাৎ যাগযজ্ঞহোম সকলই কুমারীপূজা ছাড়া সম্পূর্ণ ফলদায়ী নয়। কুমারী পূজায় দৈবী-ফল কোটিগুণ লাভ হয়। কুমারী পুষ্প দ্বারা পূজিতা হলে তার ফল পর্বতসমান। যিনি কুমারীকে ভোজন করান তাঁর দ্বারা ত্রিলোকেরই তৃপ্তি হয়।

কুমারী সম্বন্ধে এইসব প্রশস্তির দ্বারা এটাই বোঝা যায়, কুমারী দেবী ভগবতীর অতি সাত্ত্বিক রূপ। জগন্মাতা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েও চিরকুমারী। সেইজন্য প্রত্যেক শক্তিপীঠেই কুমারী পূজার রীতি প্রচলিত। আসামে কামাখ্যা মন্দিরেও কুমারী-পূজা প্রচলিত। দেবীর এই কুমারী রূপ ও কুমারী পূজা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণেও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবীকে কুমারীরূপে প্রণাম জানানো হয়েছে—"কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।" দেবী পুরাণে এই নামের স্বপক্ষে বলা হয়—"কুমারী-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা। কুমারী রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।" অর্থাৎ তিনি রূপে কুমারী, কুমারের (কার্তিকেয়) জননী এবং কুমারীরূপেই রিপুনাশিনী (ইন্দ্রিয়গণ তো শত্রুর মতোই দুর্দমনীয়) বলেই তাঁকে কুমারী হিসাবে স্মরণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, জগন্মাতা সবকিছুর সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েও চিরকুমারী। সেই অর্থে

তিনি এক ও অদ্বিতীয়া। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী সেই কথাই বলেছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) অর্থাৎ শক্তিরূপে জগতে কেবল আমিই একমাত্র বিরাজিতা। আমার তুল্য দ্বিতীয় কোন্ শক্তি আছে?" এখানে স্পষ্টতই দেবী ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদতত্ত্বের কথাই বলেছেন। এবং উপনিষদেও ব্রহ্মকে কুমার এবং কুমারী দুই-ই বলা হয়েছে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"[২৩]

কিন্তু এসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও যেহেতু দুর্গা শিবজায়া—শিবের ঘরণী সেজন্য তাঁকে প্রচলিত অর্থে কুমারী বলা যায় না। দুর্গাকে কুমারী বলা এবং দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার বিধান দেওয়া সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্মপুরাণের কাহিনীও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। দেবতাদের প্রার্থনায় সবংশে রাবণ নিধনের জন্য দেবীর বিল্বশাখায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বিল্ববৃক্ষতলে দেবীর বোধনের তাৎপর্যও বোধহয় এস্থলে নিহিত। বিল্ববৃক্ষে আবির্ভূতা সেই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই বোধহয় বিল্ববৃক্ষও দেবীর প্রতীক। এখানে দেবীকে বলা হয়েছে 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা'—বিল্বকাষ্ঠের অরণিতে জাত অগ্নিশিখাও 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা'। বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে কুমার ও যুবা। অগ্নি কুমার বলেই অপরিহার্য বিল্বকাষ্ঠের যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গাও কুমারী। আগেও বলা হয়েছে, দেবীর কুমারীত্ব তন্ত্রমতেও স্বীকৃত। বিভিন্ন শক্তিপীঠ, এমনকি ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারীতেও দেবী কুমারীরূপেই পূজিতা। এই কুমারী পূজার রীতি থেকেই সম্ভবত একদা বাংলাদেশে গৌরীদান প্রথা এসেছিল। আদিবাসী সমাজেও এই কুমারী পূজা বা গৌরীদান প্রথা প্রচলিত। কোন কোন আদিবাসী সমাজের কুমারী মেয়েরা আশ্বিন মাসের এক বিশেষ তিথিতে সতেরো দিন উপবাস করে 'কুমারী ওষা' ব্রত পালন করে। কাজেই

কেবল আর্য সংস্কৃতিতে নয়, অনার্য সংস্কৃতিতেও কুমারী পূজা কোন একভাবে প্রচলিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব। কুমারীর মধ্যে দৈবীভাবের প্রকাশ দেখা বা তাকে জননীরূপে পূজা করা সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার অনুষ্ঠান তারই শাস্ত্রীয় ও বাস্তবায়িত রূপ।

আকর গ্রন্থ ঃ (১) বৃহদ্ধর্মপুরাণ; (২) মার্কণ্ডেয়পুরাণ; (৩) তন্ত্রসার; (৪) পূজাপার্বণ ঃ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি; (৫) হিন্দুদের দেবদেবী ঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।

পরিশিষ্ট—৩

হিমালয় কন্যা উমা পার্বতী বা হৈমবতী

বৈদিক সংহিতায় উমা, পার্বতী বা হৈমবতীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেনোপনিষদে প্রথম উমাকে প্রকাশিত হতে দেখা যায় পরাজিত দেবতাদের সম্মুখে ব্রহ্মের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য। যক্ষরূপী ব্রহ্মের কাছে সব দেবতাদের শক্তিই যখন নিস্তেজ, তখন কৌতূহলী ইন্দ্রই মহাশূন্যে অতুলনীয়া রূপলাবণ্যবতী উমার সাক্ষাৎ পান। উমা ইন্দ্রকে বল্লেন — 'ঐ যক্ষই ব্রহ্ম'। 'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।' (৩/১২)

'অবাঙ্মনসগোচরম্' ব্রহ্মের লক্ষণা হিসাবে উমা এখানে প্রকা শিতা অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা প্রকাশিনী শক্তি। এখানে তিনি হিমালয় কন্যাও নন বা শিবের ঘরণীও নন। তবে এখানে শঙ্করাচার্য উমারূপের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

"এক, বহুশোভমানা হৈমবতী অর্থাৎ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়ী উমা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হলে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা অর্থে জ্যোতির্ময়ী বুঝতে হবে। উমা হিমালয় কন্যা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে বর্তমানা, সেইজন্য তিনি ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সমর্থা। তাই ইন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেছিলেন।

"শঙ্করাচার্যকৃত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পুরাণানুসারী। কেনোপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্কের কোন ইঙ্গিত নেই। ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যে উমা হৈমবতী, তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই উমা হৈমবতীর সঙ্গে শিবেরই বা সম্পর্ক কোথায়?[২৪] কিন্তু গবেষক Alian Daniolow এর মতে, উমা শব্দের অর্থ আলোক (Hindu Polytheison)।

বেলুড় মঠের দর্শনীয় আরতি পূজারী-ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী দ্বারা

উমা শব্দটির ব্যুৎপত্তি করলে হয় উ-মা-ক্কিপ=উমা।

'মা' শব্দের এক অর্থ দীপ্তি। গমনার্থক সৎ ধাতুতে ভূ (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অতএব ইন্দ্র যে উমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তিনি গতিশীল আলোক—তিনিই জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই হিসাবে তিনি চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। 'উ' শব্দের আর এক অর্থ শিব, 'মা' শব্দের অর্থান্তর লক্ষ্মী। শিবের লক্ষ্মী বা শিবের পত্নী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উমা শিবানী। ভারতচন্দ্র উমা শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই করেছেন —

"উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী-তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার।"[২৫]

"এই অর্থগ্রহণ করলে শিব ও শ্রী বা লক্ষ্মী একত্রিত হয়ে বিষ্ণুমায়া শিবানী চণ্ডীর সঙ্গে উমার অভিন্নতা প্রতিপাদিত করে। পুরাণ মতে 'উ' শব্দ সম্বোধনায়ক এবং 'মা' শব্দ নিষেধার্থক—এই দুই শব্দ একত্রিত হয়ে 'উমা' শব্দ নিষ্পন্ন। কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা পার্বতীকে মা মেনকা 'উ' অর্থাৎ হে কন্যা, 'মা' অর্থাৎ তপস্যা করো না, বলে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হয়েছিল 'উমা'—"[২৬]

'উমা' নামের বিচিত্র সব ব্যাখ্যা করা হয়। তার মধ্যে কতগুলি খুবই লৌকিক ও মজার। যেমন 'শিবনারায়ণকার' রামকৃষ্ণ বলেন —

" উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কালে।
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে।।"

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'উমা' শব্দের অর্থব্যঞ্জক ও সুষমামণ্ডিত কবিত্বময় ব্যাখ্যা করেন। মদনভস্মের পর অপমানিতা পার্বতী শিবকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন; অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী যৌবনপ্রাপ্তা কন্যার

এ-হেন কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্যথিতা মা-মেনকা কন্যাকে নিবৃত্ত করার জন্য সাদরে বলেন—'উমা'—'ওহে, তোমাকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়—তুমি আর তপস্যা করো না —

তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না
বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।।[২৭]

বন্ধু ও প্রিয়জনেরা তো পর্বত কন্যা বলে তাঁকে 'পার্বতী' বলেই ডাকেন, কিন্তু 'উ-ওহে, মা — তপস্যা করো না' বলে মা তাঁকে তপস্যা করতে নিষেধ করায় তিনি 'সুমুখী উমা' নামটিতে ভূষিত হন।

মাধুর্যমণ্ডিত এই নামের 'উৎস প্রসঙ্গে' ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লেখেন — "এখানে একটি তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে; 'উমা' নামটি হিমালয়-দুহিতার মূল নাম নহে; মূলে তিনি পার্বতী, গিরিজা প্রভৃতি নামেই খ্যাতা ছিলেন; যেমন করিয়া হোক, উমা নামটি তাঁহার সম্বন্ধে হইয়াছে। কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্য চমৎকৃতি বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু উমা শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে 'কুমারসম্ভবে' প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি মাত্র দেখিতে নাই।

'যতো হি তপসে পুত্রি বনং গন্তুং চ মেনকা।
উমেতি তেন সোমেতি নাম তাপ সদা সতী।।'

—যেহেতু তপস্যা করা ও বনগমন থেকে মেনকার দ্বারা নিবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যই সতীকে উমা, সোমা নাম দেওয়া হয়েছে।

"পুরাণাদিতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সেসব ব্যাখ্যায় তত্ত্ব গভীরতা যতোই থাকুক, ব্যুৎপত্তিগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না। বরাহ-পুরাণে বলা হইয়াছে—পূর্বে নারায়ণ একা ছিলেন। এই হরির পরে আর কিছুই ছিল না। তিনি একা একা কখনোই রতি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এইরূপ দ্বিতীয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধ্যাত্মিকা চিন্তা হইল; এই চিন্তা অভাব সংজ্ঞা এবং ভাস্কর-সন্নিভা। তিনি তখন দ্বিধাভূত হইলেন—এই দ্বিধাভূত রূপই হইল উমা রূপে; এই উ-মাই একাক্ষরী ভূত হইয়া উমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং এই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।"[২৮]

এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় একটাই বিষয় লক্ষ্য করার যে বেদান্তের ব্রহ্ম ও শক্তি কিংবা তন্ত্রের শিব-শক্তি প্রভৃতির পথ ধরে পুরাণগুলিতেও নানা চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সেই এক তত্ত্ব নীতি পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টা। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সৌন্দর্য ও সারমর্ম এখানেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ সত্তা বা এক-তত্ত্বই বর্তমান। মানুষ নিজ অভিরুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী পুরাণাদিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সৃষ্টি করেছে সেই এক-তত্ত্ব থেকেই। তন্ত্রেও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এক মাছের তত্ত্বকে 'যার পেটে যা সয়' বলে এক সুন্দর গল্প বলেছেন ঈশ্বর সাধনার জন্য, পুরাণাদিতেও বিভিন্ন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে মানুষের রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী।

'উমা'-ও সেইরকম এক সার্থক চরিত্র। বাৎসল্যে, মাতৃত্বে, প্রেমে, মাধুর্যে তিনি অতুলনীয়া। এমন আদরণীয়া ও বরণীয়া চরিত্র কোন শাস্ত্রে বা কাব্যে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। একই মূর্তি কন্যারূপে অতুলনীয়া, পত্নীরূপে যিনি প্রেমময়ী সতী-সাধ্বী আবার তিনিই জননীরূপে বাৎসল্যময়ী ও অতুলনীয়া শক্তির অধিকারিণী এবং সর্বজীবের আশ্রয়দাত্রী ও পালনকারিণী। শারদীয়া পূজার সময় বাংলা ভাষায় রচিত 'আগমনী'-

গানগুলিতেও দেবীর 'আবাহন থেকে বিজয়ার' মধ্যে মানবমনের চিরন্তন আকৃতিই যেন ফুটে ওঠে, যেখানে স্বর্গ ও মর্তের ভেদ প্রায় অদৃশ্য। তারই একটি উদাহরণ—

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা-মা-মা বলে কেঁদেছে।।
সোনার বরণী গৌরী আমার, ভাঙর ভিখারী জামাই তোমার।
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ তাও বেচে নাকি ভাঙ খেয়েছে।।"

দৈন্যজর্জরিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার সুপাত্রে কন্যাদান করেও দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। কন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সাজিয়ে দিয়েও শ্বশুরকুল কিংবা জামাইয়ের মন পাওয়া যায় না (ভাগ্যিস স্বর্গে পণ প্রথার প্রচলন নেই), 'ভাঙ খেয়ে' নেশাগ্রস্ত জামাইয়ের হাতে পড়ে সুরূপা সুলক্ষণা মেয়ের দুর্ভাগ্যের সীমা নেই—এই দুর্ভাবনাতেই কাল কাটান স্বর্গের মতো মর্তের জনক-জননীরাও।

তবে মেনকা-তনয়া 'উমাকে' নিয়ে এমন চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব কবি কালিদাসের। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে — 'কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননীরূপে সৌন্দর্যে মাধুর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও উমাকে পাওয়া যায় সৌন্দর্য ও মাধুর্যময়ী মূর্তিতে। এ-সম্পর্কে ডঃ দাশগুপ্তের অভিমত—"উমা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের কবিতায় উমা সলজ্জিত 'প্রাণবধূ', জটাজূটধারী রুক্ষমূর্তি মৃত্যুই তাঁহার রুদ্রবর। এই ভাবটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গের' অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ 'মরণ' কবিতাটিতে।

বিভিন্ন যুগের আরো অনেক কবিতায় ইহার স্পষ্ট-অস্পষ্ট আভাস মেলে। এখানে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভাবে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের বর্ণনার সহিতও এখানে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার ঐকমত্য লক্ষিত হয়।

"রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরনের কবিতায় উমা সৃষ্টির সৌন্দর্য-মাধুর্যময়ী মূর্তিতে স্মেরমুখা-রূপে দেখা দিয়াছেন। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' কবিতাটিতে এই ভাবটির চমৎকার রূপায়ণ। কবিতাটির একস্থলে দেখিতে পাই —

'জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে।
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।'

"রূপে-রসে পরিপূর্ণ-যৌবনা ধরণীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম-সমাহিত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যে ও নবত্বে নিত্য-নূতন করিয়া পাইতে চায় কবিচিত্ত।

"ধরণীর শ্যামশোভায় সজ্জিতা মেঘকূলে কমনীয়া উমার একটি ব্যাপক এবং গভীর মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঋতু সম্বন্ধীয় গান ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়া।"[২৯]

দুর্গতিনাশিনী রাজরানী দুর্গা

হিমালয় কন্যা পার্বতী উমা থেকে এবার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। শিবের ঘরণী — বিশ্বেশ্বরী বিশ্বেশ্বরের বামে। রাজরানী। মা অন্নপূর্ণা। সবই ঠিক। মা দুর্গার কৈলাস থেকে মর্তে এসে এই 'রাজরানীত্ব' প্রাপ্তি কিন্তু সহজে হয়নি। ভিখারি শিবকে পতিরূপে বরণ করে মর্তে অনেক দুঃখ যাতনাই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। শিবের ঘরণী হয়ে বহুদিন মা দুর্গাকে চাষবাসের ওপর নির্ভর করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছে। বঙ্গভূমিতে শিবঠাকুর প্রথমে 'কৃষাণ-দেবতা' রূপেই পূজিত হতেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তখনো এতটা সুদৃঢ় হয়নি। সে বড় কষ্টের কাল হরপার্বতীর। শিবঠাকুর কৃষাণ আর তাঁর একমাত্র অনুচর ভীম। সেই অনুচরের সঙ্গে শিব স্বয়ং খেত খামারে কাজ করেন, আগাছা নিড়ান, আল বাঁধেন, পোকার উৎপাত হলে শস্যে ওষুধ দেন। ঘরে গৃহিণী আছেন শিবানী বা দুর্গা—যিনি হিমালয়ের আদরের কন্যা উমারানী। সারাদিন খেতখামারে কাজ করার পর তাঁর সঙ্গে ঝগড়া-কোন্দলও বাঁধে শিবঠাকুরের, বিশেষত ভাঙ্ খেয়ে তাঁর যখন হুঁশ থাকে না তখনই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন উমারানী। তাই তিনি রাগ করে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি হিমালয়ে চলে যান। হুঁশ হলে শিব আবার ছোটেন হিমালয় গৃহিণীর মান ভাঙাতে সঙ্গে নিয়ে যান এক বোঝা শাঁখা কাঁধে করে। বঙ্গসাহিত্যে, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে এমনি আছে শিবের ঘর-গৃহস্থালীর প্রাথমিক চিত্র। সাহিত্যে শিবঠাকুর রাজা আর উমারানী মা অন্নপূর্ণা হন বহু পরে। অথবা বলা যায়, বঙ্গসাহিত্যে শিবঠাকুরের ভিখারি রূপ প্রথম যুগে বৌদ্ধ-প্রভাবেই হয়েছিল। সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব কমতে থাকলে ব্রাহ্মণ্য যুগের সূচনাতেই অর্থাৎ কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ প্রভৃতি কাব্য-সাহিত্যে শিব

আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। পৌরাণিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য-কাব্যে হর-পার্বতীর এই বিবর্তনের ধারাটি বড়ই চিত্তাকর্ষক। এইসব কাব্য-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোন যুগেই দেবতারা তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না অর্থাৎ মানুষই তার প্রয়োজনে দেবতাকে আপনভাবে সৃষ্টি করে এবং তাতে শাস্ত্রমর্যাদাও মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। বেদ বলে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই লীলাখেলা। জীব-জগতের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা সব কিছুই যে তাঁর লীলা বিলাস। কাজেই মর্তে এসে দেবতাদেরও সুখ-দুঃখের ভাগী হতে হয় মানুষেরই প্রয়োজনে। তাই দেবী দুর্গাকে কখনো আমরা দেখি কন্যারূপে, কখনো পত্নীরূপে, কখনো শক্তিময়ী অসুরদলনী মাতৃরূপে, কখনো সর্বেশ্বরী রাজরানী মা অন্নপূর্ণারূপে। প্রচলিত বাংলা 'আগমনী' গানেও ভিখারিণী উমারানীর 'রাজরানীত্ব' প্রাপ্তির সুন্দর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যথা —

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ওমা) লোকমুখে শুনি সত্য বল শিবানি,
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীধামে?
অপর্ণে তোমায় যখন অর্পণ করি।
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারী।
এখন নাকি তাঁর দ্বারে আছে দ্বারী,
দেখা পায় না তাঁর ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে।।
ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা আবার বল্‌ত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে।
এখন নাকি তিনি রাজা কাশীপুরে,
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে।।

"আগমনী" গানের মধ্যে মা দুর্গার এই 'রাজেন্দ্রাণী' রূপ আজ পার্থিব দৃষ্টিতেও সত্য মনে হয় যখন শারদীয়া দুর্গাপূজার চার দিনের আড়ম্বরের কথা মনে জাগে। বাংলায় মা দুর্গার পূজার আধুনিক ধুমধাম ও আড়ম্বরের সূচনা যতদূর জানা যায় রাজশাহী জেলার (এখন বাংলাদেশে) তাহিরপুরের মহারাজ কংস-নারায়ণের সময় থেকেই। পরবর্তী কালে শোনা যায়, ইংরেজ-বণিকেরাও অনেক বড় বড় দুর্গাপূজার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। লৌকিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় ভিক্ষুক শিবের ঘরণী হয়ে ভিখারিণীর জীবনযাপন মর্তলোকে দুর্গার শেষ হয় এইভাবেই। পার্থিব দৃষ্টিতে সত্যিসত্যিই মা এখন 'রাজরানী'। বারোয়ারিগুলিতে মা দুর্গার এই 'রাজরানী' রূপ যেন ফেটে পড়ে নানা বর্ণের আলোর রোশনাইয়ের মাঝে।

এবার তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে আসি। দুর্গতিনাশিনী বা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সঠিক পরিচয় কি? হিমালয়-কন্যা উমা পার্বতীকে যদিও আমরা প্রচলিত ধারণায় দেবী দুর্গারই একরূপ বলে জানি, কিন্তু উমা-মহেশ্বরের এই ধারাটি শিব-দুর্গা বা চণ্ডীর থেকে পৃথক বলেই মনে হয়। কারণ "পার্বতী উমার কোন প্রাচীন উল্লেখের মধ্যেই আমরা এই শস্ত্রধারিনী অরিমর্দিনী রূপের উল্লেখ পাই না। উমাকে প্রথমে পাইলাম কন্যারূপে—বহু শোভমানা হৈমবতীরূপে; তাহার পরে পাইলাম শিবপ্রিয়ারূপে—তাহার পরে পাই গণেশ-জননী ও কুমার জননীরূপে। তাহার পরে যখন লক্ষ্মী-সরস্বতীও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া মায়ের কন্যাত্ব স্বীকার করিলেন তখন মায়ের সোনার সংসারকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পার্বতী উমার প্রেমময়ী পত্নীত্ব এবং অনন্ত স্নেহময়ী মাতৃত্বের রূপই প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে; শিবের সহিত প্রণয় কলহ বা গৃহ কলহ ব্যতীত মায়ের ভ্রূকুটীকুটিল মুখ কখনো বড়

একটা দেখা যায় নাই — অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ তো দূরের কথা। কিন্তু মহাদেবী যখনই ভয়ঙ্করী—রণোন্মাদিনী—অসুরনাশিনী —তখনই তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। মায়ের এই অসুরনাশিনী মূর্তির সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত হইল মায়ের চণ্ডী রূপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেবীর এই অসুরনাশিনী চণ্ডী বা চণ্ডিকার ধারা মায়ের পার্বতী উমার ধারা হইতে একটি পৃথক ধারা। পরবর্তী কালে দুই ধারা নির্বিশেষে এক হইয়া গিয়াছে।"[৩০]

পার্বতী উমা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা হলেন। কি কি দুর্গতি তিনি নাশ করেন?

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।।
মহাভয়ে চাতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা প্ররিকীর্তিতা।।[৩১]

অর্থাৎ দুর্গ-নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ—'দুর্গ' শব্দের বাচ্যে এই অর্থ দাঁড়ায় আর এর সঙ্গে আ-শব্দটি যুক্ত হলে তা হন্তৃবাচক হয়। অর্থাৎ এই সকল দুর্গতি বা দুঃখ দমন করেন বলেই তিনি দেবী দুর্গা।

আবার দুর্গা 'ভব-সাগর-পারাপারের' তরণী-স্বরূপ বটেন। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে' দেবীকে তাই বলা হয়েছে —

"দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর-নৌ-রসঙ্গা।" (৪/১১)

দুর্গা কে? যিনি দুর্গম ভবসাগর পার করে দেন —

"দুর্গায়ৈ দুর্গাপারায়ৈ — " (৫/১২)

কিন্তু তিনি যে অসুর-নিধনকারিণী। হ্যাঁ, সেই অর্থেও তিনি দুর্গা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে সেকথাও আছে —

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যাং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।"
(১১/৪৯-৫০)

অর্থাৎ 'দুর্গম' নামে এক মহাসুরকে বধ করেই দেবী 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হবেন।

দেবী দুর্গার তাত্ত্বিক কোন কোন মতে তাঁকে দুর্গ-রক্ষাকারিণী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 'দুর্গা' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'দেবী ভাগবতেও' একথা পাওয়া যায় —

নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
দুর্গাদেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা।।
রক্ষা ত্বয়া চ কর্তব্যা সর্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ।। (৩/২৪)

এইসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পথ ধরে এগোলে শরৎকালে আমাদের পূজিতা উমা পার্বতী বা হৈমবতীর সঙ্গে মা দুর্গা বা শিবের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

"মনে হয়, দেবতেজঃ সম্ভূতা চণ্ডীর মতোই উমা-হৈমবতী বা দুর্গা শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন না। পরে রুদ্রাণী-অম্বিকার সঙ্গে উমা-দুর্গা মিশে যাওয়ায় উমা-দুর্গা-অম্বিকা এক দেবসত্তায় পরিণত হয়ে শিব গৃহিণী শিবানী হয়েছেন।"[১৮]

শরৎকালীন দুর্গাপূজায় মহাশক্তিরূপিণী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গারই আরাধনা করা হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' মতে দেবী স্বয়ং পূর্ণ, ব্রহ্মেরই

ন্যায়—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পাওয়া যায়—দেবীর সঙ্গে যুদ্ধরত শুম্ভাসুর যখন ঠাট্টা করে বলেন—

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।।"

অর্থাৎ ওগো দুর্গে! তোমার তো নিজের কোন শক্তিই নেই, তুমি দেবতাগণের শক্তিতেই শক্তিময়ী হয়ে আবার গর্বভরে যুদ্ধ করছ। এই কথা শুনে দেবী উত্তর দেন—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়।।"

অর্থাৎ ওরে দুষ্ট, চেয়ে দেখ, জগতে কেবল আমিই একমাত্র বিরাজিতা। আমার তুল্য দ্বিতীয় কোন শক্তি আছে? দেবতাদের শক্তি বিভূতি তাও যে আমারই এবং সেসব আমারই মধ্যে এখন প্রবেশ করছে।

এই উক্তির দ্বারা দেবী নিজের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবের কথাই উল্লেখ করেন। দেবী চৈতন্য ও শক্তিরূপে জগৎ চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন—এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাকালে আমরা বুঝি, শক্তিরূপিণী মা দুর্গা সর্বদাই আছেন—তিনি কোথা থেকেই বা আসবেন আর কোথাই বা যাবেন? বৎসরান্তে এই যে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর আহ্বান ও আরাধনা তা আসলে আর কিছুই নয়, আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের অসুররূপী অশুভ শক্তির নিধনেরই আরাধনা। দেবী সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ হয়ে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষা করেন। আর এইভাবেই দেবী 'সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' ও 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' হয়ে চিরকাল আছেন, থাকবেন।[৩২]

পরিশিষ্ট—৪

দেশদেশান্তরে দুর্গা

দেবী ভাগবতের একটি শ্লোকে আছে—

"কলা যাঃ যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।

পূজিতাঃ গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে।।"

অর্থাৎ ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামান্তরে যে সকল দেবী অধিষ্ঠাতা ও পূজিতা, তাঁরা সকলেই দেবী দুর্গার অংশসম্ভূতা। আবার দুর্গাপূজার একটি প্রণাম মন্ত্রেও আছে—

"দেশবাসিনীভ্যঃ নমঃ বা দেশবাসিন্যৈ নমঃ।"

এই মন্ত্রের দ্বারা সকল দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই প্রণাম জানানো হয়। দেশদেশান্তরে পূজিতা এই দেবীরা 'দেশবাসিনী দেবী' হিসাবেও শাস্ত্রীয় এবং ঐতিহাসিক যে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাতেও বোঝা যায় দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁরা স্বরূপত অভিন্না। বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রে দুর্গাকে বলা হয়েছে মহাশক্তিস্বরূপিণী। তিনি ত্রিভুবনে অদ্বিতীয়া। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' মতে দেবী স্বয়ং পূর্ণ, ব্রহ্মেরই ন্যায়—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী সেই কথাই বলেছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' অর্থাৎ 'শক্তিরূপে জগতে কেবল আমিই একমাত্র বিরাজিতা। আমার তুল্য দ্বিতীয় কোন শক্তি আছে?' তন্ত্র মতেও, শিব ও শক্তি অভেদ। শিবরূপী পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট, তাঁর সকল ক্রিয়া ও প্রচেষ্টা দেবীরূপিণী এই মহাশক্তির সাহায্যেই। এখানে শক্তি অর্থে ব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই বুঝতে হবে যা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। কাজেই দেশদেশান্তরের সকল শক্তিদেবী যে এই মহামায়া

মহাশক্তিরই অংশসম্ভূতা এবং 'দেশবাসিনীভ্যঃ নমঃ' অথবা, 'দেশবাসিন্যৈ নমঃ' মন্ত্রে প্রকারান্তরে যে এই মহাদেবী দুর্গারই আরাধনা করা হয় তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

বহির্ভারতে অধিষ্ঠতা দুর্গা

ঐতিহাসিকেরা বলেন, বহির্ভারতেও এক সময় বিভিন্ন দেশে দেবী দুর্গারই অনুরূপ দেবীপূজা বা মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। এই সব দেবী হলেন—গ্রিসের রুহীদেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলিদেবী, মিশরের ইস্থারদেবী, আইসিস দেবী, ভূমধ্যসাগরের ক্রীটদ্বীপের সিংহবাহিনী দেবী, জাপানের চনষ্টী দেবী, চীনের ক্যান্টন শহরের বৌদ্ধমন্দিরের শতভুজাদেবী। কোথাও কোথাও তাঁরা এখনো সগৌরবে অধিষ্ঠাতা। এইসব দেবীদের অনেকের আকৃতি দেবী দুর্গারই মতো—যাতে ভারতবর্ষীয় মাতৃপূজার প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে ভারতীয় বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথে পৃথিবীর নানা দেশে পাড়ি দিতেন, যেমন—শ্যাম, কম্বোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, জাভা, বালী, বোর্নিও, সিলিবেস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ধর্মপ্রাণ ভারতীয় বণিকেরা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ধর্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তাঁরা সঙ্গে নিতেন অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী মূর্তি—যা দেবী দুর্গারই এক নাম। এইভাবেই সম্ভবত মা দুর্গা দেশান্তরে গমন করেন এবং ভারতীয় বণিকদের মারফত ভাবের আদান-প্রদানের ফলে বহির্ভারতেও এই দেবী কোথাও কোথাও সগৌরবে অধিষ্ঠিতা হন। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'History of the Bengali Language and literature'-এ একটি আশ্চর্য তথ্য দিয়েছেন। তিন হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের একটি সিংহবাহিনী মূর্তি ভূমধ্যসাগরের ক্রীটদ্বীপে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর মতে "খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে প্রস্তুত এশিয়া মাইনরের

'ইয়াসিলি' গিরিমন্দিরের (ভোগাজ কিউ নামক স্থানে) 'মা' দেবতার মূর্তি এইরূপ — ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দের কার্থেজের দুর্গাও বোধহয় এক পঙ্‌ক্তির।'' আর এক তথ্যে জানা যায়, জাভার পম্‌বনম্‌-এ এক হাজার চণ্ডীমন্দির আছে যেসবের নির্মাণকাল সম্ভবত ৫২৭ খ্রীঃ থেকে ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

কাজেই বোঝা যায়, দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান কেবল ভারতেই নয়, বহির্ভারতেও তিনি এক সময় সগৌরবে অধিষ্ঠাতা ছিলেন এবং কোথাও কোথাও এখনো আছেন।

পুরাণে দেশদেশান্তরের দুর্গা

পুরাণগুলিতে, বিশেষত পদ্মপুরাণে দেশদেশান্তরে অধিষ্ঠাতা দেবীদের নামের এক বিস্তৃত তালিকা আছে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক সাবিত্রী দেবীর স্তবে আছে—

''সর্বগা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্বতোঽদ্ভুতা।
সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিদ্দৃশং তন্ন বিনা ত্বয়া।।
তথাপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্তব্যা ভূমিকামৈর্বা তৎ প্রবক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ।।''

অর্থাৎ সেই মহাদেবী সর্বভূতেই দ্রষ্টব্যা, সর্বগা ও সর্বপ্রকারেই অদ্ভুতা; সৎ বা অসৎ যা কিছু দৃশ্য আছে সবই তিনি, তথাপি তিনি সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের পক্ষে যে-যে স্থানে যে-যে মূর্তিতে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যা ও স্মর্তব্যা ভগবান বিষ্ণু তাই এখানে উল্লেখ করছেন। সেই তীর্থগুলি এবং সেখানে 'দেশবাসিনী'-রূপে দেবী দুর্গা যে নামে অধিষ্ঠিতা তার নাম যথাক্রমে — পুষ্করে-সাবিত্রী, বারাণসীতে — বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে— লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে — ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে—কামুকা, মানসে—

'ইয়াসিলি' গিরিমন্দিরের (ভোগাজ কিউ নামক স্থানে) 'মা' দেবতার মূর্তি এইরূপ — ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দের কার্থেজের দুর্গাও বোধহয় এক পঙ্ক্তির।" আর এক তথ্যে জানা যায়, জাভার পম্‌বনম্‌-এ এক হাজার চণ্ডীমন্দির আছে যেসবের নির্মাণকাল সম্ভবত ৫২৭ খ্রীঃ থেকে ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

কাজেই বোঝা যায়, দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান কেবল ভারতেই নয়, বহির্ভারতেও তিনি এক সময় সগৌরবে অধিষ্ঠাতা ছিলেন এবং কোথাও কোথাও এখনো আছেন।

পুরাণে দেশাদেশান্তরের দুর্গা

পুরাণগুলিতে, বিশেযত পদ্মপুরাণে দেশদেশান্তরে অধিষ্ঠাতা দেবীদের নামের এক বিস্তৃত তালিকা আছে। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক সাবিত্রী দেবীর স্তবে আছে—

"সর্বগা সর্বভূতেযু দ্রষ্টব্যা সর্বতোঽদ্ভূতা।
সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিদ্দৃশং তন্ন বিনা ত্বয়া।।
তথাপি যেযু স্থানেযু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্তব্যা ভূমিকামৈর্বা তৎ প্রবক্ষামি তেঽগ্রতঃ।।"

অর্থাৎ সেই মহাদেবী সর্বভূতেই দ্রষ্টব্যা, সর্বগা ও সর্বপ্রকারেই অদ্ভুতা; সৎ বা অসৎ যা কিছু দৃশ্য আছে সবই তিনি, তথাপি তিনি সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের পক্ষে যে-যে স্থানে যে-যে মূর্তিতে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্যা ও স্মর্তব্যা ভগবান বিষ্ণু তাই এখানে উল্লেখ করছেন। সেই তীর্থগুলি এবং সেখানে 'দেশবাসিনী'-রূপে দেবী দুর্গা যে নামে অধিষ্ঠিতা তার নাম যথাক্রমে — পুষ্করে-সাবিত্রী, বারাণসীতে — বিশালাক্ষী, নৈমিষারণ্যে— লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে — ললিতাদেবী, গন্ধমাদনে—কামুকা, মানসে—

কুমুদা, অম্বরে—বিশ্বকায়া, গোমস্তে—গোমতী, মন্দার পর্বতে—কামচারিণী, চৈত্ররথবনে—মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে— জয়ন্তী, কান্যকুব্জে— গৌরী, মলয়াচলে—রম্ভা, একাম্রকাননে—কীর্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে— বিল্বা, কর্ণিকপুরে— পুরুহন্তা, কেদারে—মার্গগায়িকা, হিমালয়ে — নন্দা, গোকর্ণে— ভদ্রকালিকা, স্থানেশ্বরে—ভবানী, বিল্বকে—বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে—মাধবীদেবী, ভদ্রেশ্বরে—ভদ্রা, বরাহগিরিতে—জয়া, কমলালয়ে—কমলা, রুদ্রকোটিতে—রুদ্রাণী, কালঞ্জরে— কালী, মহালিঙ্গে—কপিলা, কর্কোটে—মঙ্গলেশ্বরী, শালগ্রামক্ষেত্রে—মহাদেবী, শিবলিঙ্গে—জলপ্রিয়া, মায়াপুরীতে—কুমারী, সন্তানে—ললিতা, সহস্রাক্ষে— উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে—মহোৎপলা, গঙ্গায়—মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে—বিমলা, বিপাশায়—অমোঘাক্ষী, পুণ্যবর্ধনে—পটলা, সুপার্শ্বগিরিতে—নারায়ণী, ত্রিকূটে— ভদ্রসুন্দরী, বিপুলে—বিপুলা, মানমাচলে—কল্যাণী, কোটিতীর্থে—কোটরী, মাধবীবনে—সুগন্ধা, কুব্জাম্রকে—ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে—হরিপ্রিয়া, শিবকুণ্ডে—শিবানন্দা, দেবিকাতটে—নন্দিনী, দ্বারবতীতে—রুক্মিণী, বৃন্দাবনে—রাধা, মথুরায় দেবকী, পাতালে—পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে—সীতা, বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যবাসিনী, সহ্যপর্বতে— একবীরা, হরিশচন্দ্রে—চন্দ্রিকা, রামতীর্থে— রমণা, যমুনায়—মৃগাবতী, করবতীতে— মহালক্ষ্মী, বিনায়কে—উমাদেবী, বৈদ্যনাথে—অরোগা, মহাকালে—মহেশ্বরী, পুষ্পতীর্থে—অভয়া, বিন্ধ্যকন্দরে—অমৃতা, মাণ্ডব্যাশ্রমে—মাণ্ডবী, মাহেশ্বরপুরে—স্বাহাদেবী, বেগলে—প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে—চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে— বরারোহা, প্রভাসে—পুষ্করবতী, সরস্বতী নদীর উভয়তটে—বেদমাতা, মহালয়ে—মহাপদ্মা, পয়োষ্ণীতে— পিঙ্গলেশ্বরী, কৃতশৌচে—সিংহিকা, কার্তিকেয়ক্ষেত্র—শঙ্করী, উৎপলাবর্তে—লোলা, সিন্ধুসঙ্গমে—সুভদ্রা, সিদ্ধবনে—উমা, ভারতাশ্রমে—অনঙ্গালক্ষ্মী,

জলন্ধরে—বিল্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে—তারা, দেবদারুবনে—পুষ্টিদেবী, কাশ্মীর মণ্ডলে—মেধাদেবী, হিমাচলে—ভীমাদেবী, বক্রেশ্বরে—তুষ্টিদেবী, কপালমোচনে—শ্রদ্ধা, কায়াবরোহণে—মাতা, শঙ্খোদ্ধারে—ধ্বনি, পিণ্ডারকে—ধৃতি, চন্দ্রভাগায়—কালী, অচ্ছোদে—সিদ্ধিদায়িনী, বেণায়—অমৃতাদেবী, বদরিকাশ্রমে—উর্বশী, উত্তরকুরুতে—ঔষধী, কুশদ্বীপে—কুশোদকা, হেমকূটে—মন্মথা, বৈশ্রবণালয়ে—নিধি, কৈলাসে শিবধামে—পার্বতী, দেবলোকে—ইন্দ্রাণী।

পদ্মপুরাণে লিখিত ভারতের এইসব তীর্থস্থান এবং সেখানে অধিষ্ঠিতা দেবী দুর্গারই অনুরূপা দেবীরা বা দেশবাসিনীরা আধুনিককালে অনেকেই অজ্ঞাত অথবা লুপ্ত। খুবই সম্ভব এই তালিকায় অনেক বিখ্যাত দেশবাসিনী দেবীর সঙ্গে কিছু লৌকিক বা আঞ্চলিক দেবীও (এখন হয় তাঁরা অখ্যাত অথবা লুপ্ত) মিশে আছেন। আবার তন্ত্রোল্লেখিত দেবীরাও আছেন। যাই হোক, অন্য একটি পুরাণ-বৃহন্নন্দিকেশ্বরেও এইসব দেবীস্থানের তালিকা দেওয়া হয়েছে যার অনেকগুলিই আধুনিককালে পরিচিত। কিন্তু দেবী ভাগবতে যেসব তীর্থক্ষেত্র ও সেখানে অধিষ্ঠিতা দেবীদের নাম পাওয়া যায় তাতে অন্য দুটি পুরাণের সঙ্গে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

দেবী ভাগবতে চীনদেশের প্রসিদ্ধ (সম্ভবত অধুনালুপ্ত) নীলসরস্বতী নামক স্থানও দেবী দুর্গার প্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামের উল্লেখ নেই। দেবী ভাগবতে এইসব স্থান ও সেখানকার দেশবাসিনী দেবীদের মাহাত্ম্য কথায় বলা হয়েছে—

"তানি স্থানানি সম্পর্শ্যন্ জপন্ দেবীং নিরন্তরম্।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণাম্বোজং মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ।।

ইমানি দেবীনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণান্নগ সত্বরম্।।

অর্থাৎ প্রাতঃকালে এইসব দেবীস্থান দর্শন, দেবীমন্ত্রজপ ও দেবীর চরণারবিন্দ ধ্যান করলে সবরকম পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

দেবী ভাগবতে উল্লেখিত দেবীস্থান ও সেখানে অধিষ্ঠিতা দেবীদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো—যথা—পুষ্করতীর্থে—গায়ত্রী, অমরেশতীর্থে—চণ্ডিকা, প্রভাসে—পুষ্করোক্ষিণী, নৈমিষক্ষেত্রে—লিঙ্গধারিণী, পুষ্পরাক্ষস্থানে—পুরুহূতা, আষাঢ়িস্থানে—রতি, মধ্যস্থানে—পরমেশ্বরী চণ্ডমূর্তি, ভারভূতিতে—দেবীভূতি, নাকুলে—নকুলেশ্বরী, হরিশচন্দ্রে—চন্দ্রিকা, শ্রীপর্বতে—শঙ্করী, জপ্যেশ্বরে—ত্রিশূলা, আম্রাতকে—সূক্ষ্মনামিকা, উজ্জয়িনীতে—শাঙ্করী, মধ্যমেশ্বরে—শর্বাণী, কেদারাখ্যে—মার্গদায়িনী, ভৈরবাখ্যে—ভৈরবী, গয়ায়—মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে—স্থাণুপ্রিয়া, কনখলে—উগ্রা, বিমলেশ্বরে—বিশ্বেশা, অট্টহাসে—মহানন্দা, মহেন্দ্র পর্বতে —মহান্তকা, ভীম নামক স্থানে—ভীমেশ্বরী, বস্ত্রপথে—ভবানী, অর্ধকোটিকে—রুদ্রাণী, অবিমুক্তক্ষেত্রে (বারাণসী)—বিশালাক্ষী, মহালয়ে—মহাভাগা, গোকর্ণে—ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে—ভদ্রাদেবী, সুবর্ণাক্ষে—উৎপলাক্ষী, স্থাণুসংঞ্জকে—স্থান্বীশা, কমলালয়ে—কমলা, কুরণ্ডলে—ত্রিসন্ধ্যা, মাকোটে—মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশাখ্যে—শাশুকী ও কালগঞ্জর গিরিতে—কালিকা।

তন্ত্রে দেশান্তরেরর দুর্গা

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রেও দেশদেশান্তরের এইসব দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও তাঁরা ভীম, চণ্ডী, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবী দুর্গারই বিভিন্ন নামে অধিষ্ঠিতা। ভারতের একান্ন শক্তিপীঠে অধিষ্ঠিতা

'কালী' ছাড়া তন্ত্রে এমন অনেক দেবীর নাম আছে যাঁরা 'দুর্গার'ই অনুরূপা। 'প্রাণতোষিণী'-তন্ত্র ছাড়াও মুণ্ডমালাতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে এমন অনেক দেবীরও নাম আছে। কোথাও কোথাও এইসব দেবী আঞ্চলিক অধিষ্ঠাত্রী দেবীতেও পরিণত হয়েছেন বলে মনে হয়। যেমন বাঁকুড়া জেলার উত্তরবার গ্রামে দশভূজা শিলামূর্তি 'ঝগড়াভঞ্জনী' নামে পরিচিতা ও পূজিতা। আবার বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে মহামারীর দেবী 'খচ্চরবাহিনী' নামে পরিচিতা ও মৃন্ময়ী মূর্তিতে অধিষ্ঠিতা—যিনি শারদীয়া মহানবমীতে বিশেষভাবে পূজিতা হন। দেশদেশান্তরের এইসব দেবীর অনেকের বৌদ্ধতন্ত্রেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে অথবা একীভূত হয়ে আছেন। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের চণ্ডিকা, বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, ভট্টারিকা—আর্য-তারা, মহামায়ূরী, জম্ভলা, হেরুকা প্রভৃতি দেবী হিন্দু-তন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মের উমা, হিঙ্গলক্ষ্মী উমা, চণ্ডিকা, লিঙ্গকালী, বসুন্ধরা প্রভৃতি দেবীর রূপান্তর।

দেশেদেশে লৌকিক দেবীরূপে দুর্গা

দেশদেশান্তরে কোথাও কোথাও লৌকিক দেবীরূপেও পূজিতা, অবশ্য ভিন্ন নামে। এইসব দেবীর মধ্যে 'চণ্ডীর'ই প্রাধান্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে এই দেবীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রাচীনত্ব অথবা আর্যত্ব বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'চণ্ডী' শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা থেকে উৎপন্ন। কোনও কোনও আদিবাসী-উপজাতি 'চাণ্ডী' নামে এক দেবীর পূজা করে থাকে বিশেষ বিশেষ দিনে। লৌকিক দেবী হিসাবে 'চণ্ডী' নামের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন—নটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ান চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণ চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, বসন চণ্ডী, ফুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী, খাড়া শুভ চণ্ডী, রথাই চণ্ডী, অবাক চণ্ডী,

কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী, প্রভৃতি। মঙ্গল চণ্ডী আবার অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পূজিতা, যেমন নিত্যা মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরে পূজিতা চণ্ডীদেবীর আরো কয়েকটি লৌকিক নাম পাওয়া যায়। যেমন—খেপাই চণ্ডী, মেলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, কুলাই চণ্ডী, হাড়িঝি চণ্ডী প্রভৃতি। লৌকিক বা আঞ্চলিক এইসব চণ্ডীদেবী যেমন ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতা ও পূজিতা, তাঁদের পূজার উপচারও সর্বত্র এক নয়। আদিবাসীদের দ্বারা পূজিতা এক দেবীর নাম জগাই চণ্ডী। পূজার উপচার—গোটা ফল, চোলাই মদ ও পাঁঠা। পূজারীর আসনে বসেন এক ওঝা। পূজার সময়—মধ্যরাত্রি।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, দেশদেশান্তরে অধিষ্ঠিতা ও পূজিতা সব চণ্ডী দেবীই কিন্তু পৌরাণিক দেবী নন। বহু শতাব্দীর বিবর্তনের দ্বারাই এঁরা বর্তমানে স্ব-স্ব মহিমায় অধিষ্ঠিতা। এঁদের অনেকের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের কোন কোন দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলের' কাব্যগুলিতে এই দেবীর আবির্ভাব ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে লৌকিক দেবী হিসাবে অধিষ্ঠানের বহু বিচিত্র সব কাহিনী জানা যায়। দেশদেশান্তরে দেবী চণ্ডীই জনপ্রিয়তায় সবার শীর্ষে এবং দুর্গাপূজায়ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ অবশ্য কর্তব্য। আর আমরা জানি, বহু বিতর্কিত এই দেবী প্রচলিত ধারণাতেও দেবী দুর্গারই অভিন্ন সত্তা।

উপসংহারে বলি, আধুনিককালে কিন্তু এই দেবী 'দুর্গা' নাম নিয়েই দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছেন প্রতি বছর মহালয়ার আগেই। এখন আর তাঁকে প্রাচীনকালের মতো নাবিকদের সঙ্গে দীর্ঘ সমুদ্র পথে যেতে হয়

না। এখন মা দুর্গা পাশ্চাত্যের বহু দেশে, বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকায়, কত না আধুনিক সাজে সজ্জিতা হয়ে সেখানকার ভক্তদের আহ্বানে উড়োজাহাজে অর্থাৎ এরোপ্লেনে তিন দিনে তিন মাসের পথ অতিক্রম করে এসে (অর্থাৎ বাহিতা হয়ে) সাড়ম্বরে সেইসব দেশে পূজিতা হচ্ছেন এবং সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোককেই আকর্ষণ করছেন। দেশদেশান্তরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি সকলেই এই মায়ের সন্তান, তাই বলি বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন এই শারদীয়া পূজার চার দিন যেন শুধু একটাই ধ্বনি তথা ঐকতান ধ্বনিত হয় — ''জয় 'দুর্গামায়ী' কী জয়!''[৩৩]

গ্রন্থোক্ত পাদটীকা

১) সংগীত সংগ্রহ, ১৯৯৫
২) 'The Master as I saw Him', Sister Nivedita
৩) স্বামি-শিষ্য সংবাদ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ ২২৮—২৯ (১২শ প্রকাশ, ১৪০৩)
৪) স্বামীজীর পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ১৫৪
৫) শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ২২২
৬) তদেব, পৃঃ ৫৪
৭) তদেব, পৃঃ ৫৫
৮) স্বামি-শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড, পৃঃ ২২৭
৯) তদেব, পৃঃ ২১৯
১০) তদেব, পৃঃ ২৩১
১১) সারদা রামকৃষ্ণ, সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরীদেবী
১২) স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ২৮২ (২য় সংস্করণ, ১৩৮৯)
১৩) স্বামী প্রেমানন্দ (২য় ভাগ), স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ
১৪) শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৩৪২
১৫) তদেব, পৃঃ ৩৪৩
১৬) তদেব, পৃঃ ৩৪৩-৪৬
১৭) তদেব, পৃঃ ৩৪৫
১৮) মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, (২য় সংস্করণ, ১৩৮৭) পত্র সংখ্যা ৮০, পৃঃ ১২৪
১৯) অতীতের স্মৃতি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পৃঃ ৩১ (পরিশিষ্ট 'ক') (৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০২)
২০) উদ্বোধন, শারদীয়া, ১৪০৩
২১) হিন্দুদের দেবদেবী, ৩য় পর্ব, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
২২) পূজাপার্বণ, পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি
২৩) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪/৩
২৪) হিন্দুদের দেবদেবী, ৩য় পর্ব
২৫) অন্নদামঙ্গল কাব্য
২৬) হিন্দুদের দেবদেবী, ৩য় পর্ব
২৭) কুমারসম্ভব, ১/২৬
২৮) ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ২৭
২৯) তদেব, পৃঃ ৩২৮
৩০) তদেব, পৃঃ ৪১
৩১) শব্দকল্পদ্রুম্
৩২) শারদীয়া 'সমাজশিক্ষা' (১৪০২)
৩৩) সাপ্তাহিক বর্তমান (৯ই অক্টোবর, ১৯৯৪)

উদ্বোধন প্রকাশনার কতিপয় পুস্তক

কলকাতাবাসিনী শ্রীমা সারদামণি

দেবী-মানবী সারদা

শান্তিরূপিণী সারদা

কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ

চিরজাগ্রত বিবেকানন্দ

বেলুড় মঠে কুমারী পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

মূল্য ঃ ২৫.০০

Belur Mathe Swamijir Durgapuja

₹ 25.00